সাত দিন

সাত দিন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬২
প্রকাশক—শ্রীবিমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
গ্রন্থশ্রীর পক্ষে
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

। সূচীপত্র ।

শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীমতী বাসনা মুখোপাধ্যায়

জামাতা-কন্যাকে উপহার দিলাম

৪৩।৫।বি, বালিগঞ্জ প্লেস

কলিকাতা-১৯

২৩ আশ্বিন ১৩৬২

সাত দিন

১

বেলা তখন এগারোটার কাছাকাছি।

উগ্র খেয়ালী সুধানাথ মুখুজ্জে দক্ষিণ কলকাতার এক জনবিরল গলি দিয়ে বাঁ হাত অল্প নাড়তে নাড়তে, বোধ করি কোন এক খেয়ালেই মশগুল হয়ে পথ চলছিল।

সুধানাথরা উত্তর-প্রদেশের ক্ষুদ্র এক শহরের তিন পুরুষের অধিবাসী। আর্থিক অবস্থা ভাল। জোত আছে, জমি আছে ; তা ছাড়া, পৈতৃক আমলের মহাজনী মোটা কারবার আছে। উত্তর-প্রদেশের বাড়িতে সুধানাথের বড় ভাই উষানাথ সপরিবারে বাস ক'রে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করে।

অল্পবয়সে পিতামাতা হারিয়ে সুধানাথ পাটনায় মাতুলালয়ে থেকে কলেজের লেখাপড়া শেষ করেছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে উজ্জ্বল রত্ন। পদার্থবিদ্যায় এম্. এস্-সি. পরীক্ষায় যে নম্বর পেয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পর্যন্ত আর কেউ তার কাছাকাছিও যেতে পারে নি।

এম্. এস্-সি. পরীক্ষা পাস করার পর দিল্লীতে আই. এ. এস. পরীক্ষা দিয়ে নিছক আড্ডা দেবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় ফার্ন রোডে তার বন্ধু বিজয়লালের বাসায় এসে উঠেছে।

একটা কিছু চিন্তা করতে করতে কতকটা অন্যমনস্ক হয়েই সুধানাথ

পথ চলছিল, এমন সময়ে গলির বাঁকের মাথায় বই হাতে উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের একটি অপরিচিত সুন্দরী মেয়ে আবির্ভূত হ'ল। সম্ভবতঃ কলেজ থেকে প্রত্যাগমনের পথে ট্রাম থেকে নেমে বাড়ি ফিরছে।

মেয়েটির মুখে চোখে, কুঞ্চিত অলকে, দেহভঙ্গীর ছন্দে এক অনির্বচনীয় অতিদাহ্য ইন্ধনের জোগান পেয়ে সহসা সুধানাথের মনের মধ্যে খেয়ালের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে বহুবার বহু প্রকারের খেয়ালের খেলা সে খেলেছে; কিন্তু এবারকার চূর্ণকুন্তলের জটিলতাকে আশ্রয় ক'রে খেয়ালের যে লীলা, শুধু তা অভূতপূর্বই নয়,—যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি বিপজ্জনক।

মেয়েটি কাছাকাছি এলে অতর্কিতে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে গতিরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সুধানাথ প্রশ্ন করলে, "কলেজ থেকে ফিরছ?"

'তুমি' সম্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যেও মেয়েটি অতি-অবশ্যই সুধানাথকে চিনতে পারলে না,—তবু সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করা গেল না; বললে, "হ্যাঁ।"

"আশুতোষ কলেজ থেকে তো?"

এ কথাও স্বীকার ক'রে বলতে হ'ল, "হ্যাঁ।"

"এই পাড়াতেই থাক?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও কাছাকাছি থাকি।"

"ও!"

"আচ্ছা, ধীরেন এখন কোথায় আছে?"

"কে ধীরেন?"

মনে মনে সুধানাথ বললে, তা কি ছাই আমিই জানি? প্রকাশ্যে

বললে, "আমার বন্ধু ধীরেন বোস, তোমার পিসতুতো দাদা,—যার বাড়িতে দিন দুই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

মেয়েটি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তা হ'লে চিনতে না পারার অস্বস্তিতে এতক্ষণ যে পীড়িত হচ্ছিল, তার কোনও কারণ ছিল না, অচেনাই। বললে, "ধীরেন নামে আমার কোন পিসতুত দাদা নেই। আপনি আমাকে ভুল করছেন।"

এক মুহূর্ত বিস্মিত অপলক নেত্রে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে সুধানাথ বললে, "তোমাকে নিশ্চয় ভুল করছি নে; ভুল করছি তা হ'লে ধীরেনকে। ধীরেনের বাড়ি তোমাকে না দেখে অন্য কোথাও দেখে থাকব। আচ্ছা, তোমার নাম কি বল তো?"

এ প্রশ্নে মেয়েটি বিরক্ত বোধ করলে। সে যখন অপরিচিত যুবকের বন্ধুর মামাতো বোন নয়, তখন কথাবার্তা ঐখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল; বিশেষতঃ তার পরও তাকে 'তোমার' শব্দের দ্বারা সম্বোধিত করা একেবারেই মার্জিতরুচির পরিচায়ক নয়; তথাপি নামটা জানালে প্রসঙ্গটা একেবারে শেষ হতে পারে মনে ক'রে বললে, "আমার নাম বাসন্তী চাটুজ্জে।"

চাটুজ্জে শুনে সুধানাথের মন উল্লসিত হয়ে উঠল। তা হ'লে প্রথম অঙ্কেই যবনিকা-পাত হয়ে নাটকটা নিতান্তই মাঠে মারা যাবে না, তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া চলবে; এমন কি, সৌভাগ্যের সহায়তা থাকলে, পঞ্চমাঙ্ক পর্যন্তও। তার পর শেষ দৃশ্যের যবনিকা-পাত আনন্দান্ত হবে, অথবা বিষাদান্ত—খেলোয়াড়ী অভিনেতা তার জন্যে মাথা ঘামায় না, ভাগ্যের উপরই সে-অনিশ্চয়তাকে সে ফেলে রাখে।

বাসন্তী পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে উদ্যত হয়েছে দেখে হাসিমুখে সুধানাথ বললে, "যাবার আগে একটা কথা শুনে যান।"

'শুনে যান'! তা হ'লে শিষ্টতার বোধ একেবারে নেই তা নয়। একটুখানি খুশী হয়েই বাসন্তী বললে, "কি কথা?"

সুধানাথ বললে, "দেখুন, মানুষের মন ভারি অদ্ভুত জিনিস। কত চিন্তা আমাদের মনে সর্বদা উদয় হচ্ছে, অথচ আমরা মানুষেরা চিন্তা চাপতে অভ্যস্ত হ'লে সে সব চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে চাপা থেকেই মারা যায়। আজ কিন্তু আমি আমার মনের একটা চিন্তা কিছুতেই চেপে না রাখবার পরীক্ষা করব স্থির করেছি। মনের খাঁচার দোর খুলে আমার এখনকার চিন্তাকে আকাশে উড়িয়ে দেবার জন্যে আজ আমার মনে কৌতূহলের অন্ত নেই।...ধীরেন বসু আর তার মামাতো বোন মিথ্যের সৃষ্টি। রুইমাছ ধরবার জন্যে পুঁটিমাছদের সৃষ্টি ক'রে টোপ ফেলেছিলাম। আসল কথা, আপনি যখন আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন তখন আপনার অপরূপ মূর্তির মধ্যে কিসের যেন সন্ধান পেয়ে মনে হচ্ছিল, আপনার মতো একটি মেয়ে যদি অদৃষ্টে জোটে, তা হ'লে বহু অনুরোধে-উপরোধে এ পর্যন্ত যে কাজ করি নি, তাই করি। রাগ করবেন না, আপনার মতো মেয়ে বলেছি, আপনাকে বলি নি।"—ব'লে সুধানাথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

অপরিচিত ব্যক্তির এই অমার্জনীয় ধৃষ্টতা দেখে ক্রোধে বাসন্তীর মন উত্তপ্ত হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডলকে আরক্ত ক'রে তুললে। এই দুর্বিনীত দুঃসাহসিকতাকে নীরবে পরিপাক ক'রে চ'লে যাওয়ার পরাজয় মেনে নিতে মন অস্বীকার করছিল, অথচ এর প্রতিবাদের যথোচিত কঠোর ভাষাও মুখে জোগাচ্ছিল না। এমন সময়ে সুধানাথই সঙ্কট মোচন করলে। বললে, "আমি তো আমার মনের চিন্তা আকাশে ওড়ালাম। এর ফলে আপনার মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছে আপনিও তা যদি আকাশে ওড়ান, তা হ'লে কৃতার্থ হই।"

বদ্ধগভীর স্বরে বাসন্তী বললে, "অকপটে ওড়াব ?"

ব্যগ্রকণ্ঠে সুধানাথ বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, অকপটেই ওড়াবেন। এখন তো আমাদের অকপটের পালাই চলেছে।"

এক মুহূর্ত কি চিন্তা ক'রে আরক্তমুখে বাসন্তী বললে, "দেখুন, আপনার সমস্যা আমার মতো একটি মেয়ের ; আমাদের সংসারে কিন্তু উপস্থিত গুরুতর সমস্যা চাকরের। আপনাকে মনের চিন্তা ওড়াতে দেখে আমার মনে হচ্ছে, যদি আপনার মতো একটি চাকর পাওয়া যায়, আপনার মতো হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ, আপনার মতো এমনি চৌটকাটা, তা হ'লে সংসারের সত্যিই উপকার হয়। রাগ করবেন না, আপনার মতো চাকর বলেছি, আপনাকে বলি নি।"

বাসন্তীর কথা শুনে সুধানাথের দুই চক্ষু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল ; প্রসন্ন-ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "না না, নিশ্চয়ই রাগ করব না। আপনার মতো মেয়ের সন্ধান আপনি তো দিলেন না ; অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'লে হয়তো কোনদিন দয়া ক'রে দিতেও পারেন। আমি কিন্তু ঠিক আমার মতো চাকর আপনাকে দেব। এতই আমার মতো যে, যখন সে আপনাদের বাড়ি গিয়ে দাঁড়াবে, মনে হবে আমিই যেন গেছি। দুর্দান্ত কাজের লোক। আপনার নিজের সমস্ত কাজ এমন প্রাণ দিয়ে করবে যে, বাড়ির লোকের কাছে আপনি অপ্রতিভ হয়ে থাকবেন।" তার পর পকেট থেকে নোটবুক বার ক'রে বললে, "বলুন, কি আপনাদের ঠিকানা। কাল সকালেই লোক পাঠাব।"

"না, আপনাকে পাঠাতে হবে না।"—ব'লে বাসন্তী দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

খানিকটা গিয়ে পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখলে। মনে হ'ল, গতি পরিবর্তিত ক'রে লোকটা যেন পথচারীদের আড়ালে আড়ালে

তাকে অনুসরণ ক'রে এগোচ্ছে। তার দীর্ঘ দেহের মাথার খানিকটা অংশ যেন পথিকদের মাথা ছাড়িয়ে মাঝে মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে। গৃহের সম্মুখে এসে আর একবার তাকিয়ে দেখে মনে হ'ল, লোকটা যেন আরও কাছাকাছি এসে পড়েছে। গৃহে প্রবেশ ক'রে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে গিয়ে বাসন্তী জানলার ঝিলমিলি সামান্য একটু ফাঁক ক'রে চোখ পেতে তাকিয়ে রইল। বেশী দেরি হ'ল না, মিনিট খানেকের মধ্যে লোকটা তাদের বাড়ির সামনে এসে শুধু বাড়িটাই দেখলে না, দরজার মাথার ওপর বাড়ির নম্বরটাও যেন লক্ষ্য ক'রে গেল।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল বাসন্তী। যা দুঃসাহসী লোক, ঠিকানা নিয়ে চিঠি-চাপাটি আরম্ভ না করে!

প্রথমে বাসন্তী মনে করেছিল, বাড়ি পৌঁছেই পথের এই বিচিত্র কাহিনী তার মাকে সবিস্তারে গল্প ক'রে শোনাবে। কিন্তু ভেবে দেখলে, সেটা নিরাপদ হবে না। মেয়েদের বেশী উচ্চশিক্ষায় অবিশ্বাসী তার মাকে অনেক সাধাসাধি ক'রে তবে বি. এ. ক্লাসে নাম লেখাতে সে সক্ষম হয়েছিল। সমর্থ বয়সের মেয়েরা একা পদব্রজে কলেজ যাতায়াত করে এ তার মার আদৌ পছন্দ নয়,—তার ওপর কলেজ-যাতায়াতের পথে কন্যার পিছনে চিন্তা ওড়াবার লোক জুটেছে শুনলে আর রক্ষা থাকবে না।

কাজেই কথাটা শুধু তার নিজের মনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে সারাদিন তাকে মাঝে মাঝে বিদ্ধ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে মনকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিলে যে, সংসারে কত রকমই তো পাগল থাকে, এও হয়তো এক রকম চিন্তা-ওড়ানো পাগল।

২

পরদিন বেলা এগারটার পর কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে বাসন্তী দেখলে, তার মা বিজয়া পূজার জায়গায় ব'সে চন্দন ঘষছে। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ কি মা, এখনো তোমার পূজো হয় নি ?"

বিজয়া বললে, "কি ক'রে হবে ? নতুন চাকর এল, তার পেছনে এতক্ষণ লেগে থেকে তারপর পূজোয় বসেছি।"

শুনে বাসন্তীর বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। সন্ত্রস্ত মনে বললে, "কে দিলে মা চাকর ?"

"বোধ হয় ভগবানই দিলেন,—এখন বরাতে টেকলে বাঁচি! তুই কলেজ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এল। উনি বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছেন, এসে বললে—চাকর রাখবেন বাবু ?"

বিজয়ার বিবৃতির মধ্যে বাধা দিয়ে বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে বাসন্তী বললে, "আর অমনি তোমরা রেখে দিলে ? চোর, না ডাকাত, না মতলববাজ, কোনো সন্ধান নিলে না ? আজকালকার দিনে চাকর অমনি রাখলেই হ'ল ? কেন, জানাশোনা লোক পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত পাঁচীকে দিয়েই কষ্টে-স্থষ্টে চালিয়ে নিলেই তো হ'ত।"

পাঁচী সংসারের ঠিকা ঝি।

বাসন্তীর উৎকণ্ঠা দেখে কৌতুক অনুভব ক'রে হাসিমুখে বিজয়া বললে, "কোনো ভয় নেই তোর,—খুব বিশ্বাসী লোক। ওর সঙ্গে ফার্ন রোডের কোন্ বিজয়লালবাবুর পরিচয়পত্র ছিল, তোর দাদা তখনি সেই চিঠি নিয়ে গিয়ে বিজয়লালবাবুর সঙ্গে মোকাবিলা ক'রে এসেছে। বিজয়লালবাবু মস্ত লোক—নিজের বাড়ি, গভর্মেণ্টের বড় অফিসার। বলেছেন, ওঁদের দেশের প্রজা, খুব বিশ্বাসী লোক, স্বভাবচরিত্রেও খুব ভাল। ওর হাতে গয়নার আলমারির চাবি দিয়ে সিনেমা দেখা চলে।"

এ কথা শুনে বাসন্তী একটু আশ্বস্ত বোধ করলে। বিজয়লালবাবু যখন চাকরের পরিচয় দিয়েছেন, তখন অপর লোকও হতে পারে। বললে, "সাড়াশব্দ কিছু পাচ্ছি নে, আছে কোথায় ?"

"সমস্ত কাজকর্ম সেরে আমার পূজোর জল আনতে গঙ্গায় গেছে। দুর্দান্ত কাজের লোক। কাজের টুঁটি টিপে ধরে, আর দেখতে দেখতে শেষ করে ; ভাঙে না, চোরে না, অথচ পরিচ্ছন্ন কাজ। সাবান চেয়ে নিয়ে তোর শাড়ি সায়া জামা ধোপার বাড়ির মতো ধবধবে ক'রে কেচে দিয়েছে। বলেছে, কাল তোর ঘরের ঝুল ঝাড়বে। তোর ঘরের আসবাবপত্র ঝেড়ে-ঝুড়ে খাটের তলা পর্যন্ত ঢুকে সমস্ত ঘর পরিচ্ছন্ন ক'রে ঝাঁট দিয়েছে। তোর জুতো দু-জোড়া ঝেড়ে-মুছে কি রকম ঝক্‌ঝকে করেছে দেখ্‌গে যা। বলছিল—দিদিমণি এলে ও-জোড়াও পরিষ্কার ক'রে রাখব।"

শুনে বাসন্তীর মন আবার দ'মে গেল। নাঃ! প্রথম দিন আবিভূ‌ত হয়েই অপ্রতিভ করবার এতটা ব্যবস্থা যে করেছে, সে আর অন্য কেউ নয়,—সে-ই!

প্রস্থানোদ্যত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বাসন্তী বললে, "কি নাম মা চাকরের ?"

"নিমাই। নিমাই দাস। শোন্‌ বাসু, নিমাই তেতেপুড়ে আসবে, এলে একটু জল খেতে দিস।"

কোনও উত্তর না দিয়ে বাসন্তী গভীর চিন্তিত মনে প্রস্থান করলে। মনে মনে বললে, তুমি তো কাজের চাকর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পূজোয় বসলে মা,—কিন্তু ঐ ধড়িবাজ লোককে নিয়ে তোমার মেয়ের জীবন যে এ বাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, তা তো জান না!

৩

দড়ির আলনায় শাড়ি সায়া ব্লাউজের ধপধপানি দেখে বাসন্তীর মনে প্রায় ক্রোধের সঞ্চার হ'ল ; মনে হ'ল, ধৌতকারীর পরিচয় যেন তার মধ্যে দাঁত বার ক'রে হাসছে। ঘরে ঢুকে কক্ষের সর্বত্রব্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতা দেখে মন হ'ল মলিন ; আর জুতো দু-জোড়ার ঝক্‌ঝকে নির্মলতা দেখে একটা অনির্ণেয় সন্ত্রাসে চকিত হয়ে উঠল চিত্ত। মনে হ'ল, যে মানুষ এত নিম্নে এমন ক'রে হাত চালাতে পারে, তার হাতে কোন কিছুই আটকাবে না।

দৈনন্দিন নিয়ম অনুযায়ী তার জন্যে টেবিলের উপর একটু খাবার ঢাকা রয়েছে ; আজ তা খেতে ইচ্ছা করল না। কুঁজো থেকে জল ঢেলে খানিকটা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে বসল, কিন্তু মন বসে না। একটু পরে কড়ানাড়ার শব্দ থেকে যে জটিল সমস্যাতিপাত আরম্ভ হবে, তার দুশ্চিন্তায় চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হতে লাগল।

খুট-খুট-খুট-খুট-খুট !

বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। তা হ'লে এসে গেছে !

কিন্তু দুর্বল হ'লে আরও পেয়ে বসবে। মনকে কঠোর এবং অক্ষমাশীল ক'রে নিয়ে সদর-দরজায় উপস্থিত হয়ে হুড়কো খুলে বাসন্তী দেখলে, মূর্তিমানই বটে ! খালি পা, খালি গা, মালকোঁচা মারা, কোমরে একখানা লাল গামছা বাঁধা, কাঁধে গঙ্গাজলের কলসীর ভারে অবনত মুখের ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে পিত্তি-জ্বালানো দীপ্তি।

পাশে স'রে গিয়ে বাসন্তী সুধানাথের যাবার পথ ক'রে দিয়ে দাঁড়াল। তারপর হুড়কো লাগিয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে পুনরায় খবরের কাগজের উপর দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বিচলিত মনের স্থৈর্য ফেরাতে নিযুক্ত হ'ল।

মিনিট দুই পরে সুধানাথ কক্ষে প্রবেশ করলে। নিমেষের জন্য একবার তাকে তাকিয়ে দেখে বাসন্তী দৃষ্টি নত করলে।

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে খানিকটা নত হয়ে প্রণাম ক'রে বিনীত কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "আপনিই তা হ'লে এ বাড়ির দিদিমণি?"

মুখ তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাসন্তী বললে, "কেন, সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ আছে নাকি?"

সুধানাথ বললে, "আজ্ঞে দিদিমণি, আমি তো আপনাকে আগে কখনো দেখি নি, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"ওঃ! আগে কখনো দেখ নি! আর, কাল যে আমাকে পথে আটকে পনেরো মিনিট ধ'রে মনের চিন্তা আকাশে ওড়ালে, সে বুঝি তোমার ভূত?"

সুধানাথের মুখে সমস্যাভঙ্গের নিঃশব্দ নিশ্চিন্ত হাস্য ফুটে উঠল। বললে, "তাই বলুন! সে আমার ভূত হতে যাবে কেন দিদিমণি, সে আমার যমজ দাদা—নিতাই দাস। সেই তো আমাকে আজ আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে। তা আপনার দোষই বা কেমন ক'রে দিই? নিতাই দাস আর নিমাই দাস তো অনেকটা এক রকমই দেখতে।"

ধমকে উঠল বাসন্তী, "অনেকটা একরকম?"

চমকে উঠে সুধানাথ বললে, "এই দেখুন, রেগে যাচ্ছেন আপনি! আচ্ছা, অনেকটা একরকম নয়, প্রায় একরকম।"

"প্রায়ও নয়।"

"তবে?"

"ঠিক একরকম,—কারণ নিতাই দাস আর নিমাই দাস একই লোক।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ক্ষণকাল বিহ্বল নেত্রে বাসন্তীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে সুধানাথ বললে, "এই দেখুন, খামকা বখেড়া লাগাবার চাইছেন।

নিতাই দাস আর নিমাই দাস যদি একই লোক হবে, তা হ'লে তাদের মা দুজনের এক নাম না রেখে আলাদা আলাদা কেন রেখেছেন, তা বলুন! নিতাই যদি নিমাই-ই হয়, তা হ'লে আমি ক্যামনে নিমাই হলাম, তাও কন!"

বাসন্তীর দুই চক্ষু শ্লেষে কুঞ্চিত হ'ল। বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললে, "ওঃ! আবার ন্যাকা-ন্যাকা কথা কওয়া হচ্ছে! কাল তো তোমার মুখ দিয়ে খুব চোখা-চোখা কথা বেরুচ্ছিল!"

বিমূঢ় মুখে সমস্যাপীড়িত স্বরে সুধানাথ বললে, "হেই দেখ, আবার সেই কথা! সে কি আমি দিদিমণি? সে তো নিতাই দাস। ম্যাটিক ফেস্, বেঁজায় পণ্ডিত! চোখা-চোখা কথা সে কইবে না তো কি মুরুখ্যু মানুষ আমি কইব?"

"কেন, তুমি আবার কি-ফেল ক'রে মুরুখ্যু হয়েছ?"

এবার সুধানাথের মুখে একরাশ হাসি ফুটে উঠল; বললে, "আমি ফেল্ করি নি দিদিমণি। আমি ফোং কেলাসে উঠে পরীক্ষেই দিই নি।"—ব'লে হেসে উঠল।

ফোং কেলাস শুনে বাসন্তীর অঙ্গ গেল জ্ব'লে! উঃ! কি তঁ্যাদোড় মানুষ! ম্যাটিকের সঙ্গে ফোং কেলাস ঠিক মিলিয়ে দিয়েছে! হঠাৎ খেয়াল হ'ল, ওর র-ফলা আর রেফের উচ্চারণ-বিভ্রাটের সততার বিষয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলে হয়। বললে, "গঙ্গাজল কিসে নিয়ে এলে তুমি?"

উৎফুল্ল মুখে সুধানাথ বললে, "কলসীতে বটে।"

"সে কথা জিজ্ঞাসা করছি নে। জল তো এল কলসীতে, তুমি এলে কিসে?"

সুধানাথের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল, "তাই বলেন! এনু ট্যাম

গাড়িতে, গেছনু বাসে। বাস লাফায়, জল উছলে পড়ে। ট্যাম গাড়ি লাফায় না।"

ট্যাম গাড়ি! নাঃ! জ্বালালে দেখছি! একটা অতি কৃশ সংশয়ে বাসন্তীর মন দোলায়িত হ'ল,—তা হ'লে কি সত্যি-সত্যিই কালকের সে আজকের এ নয়? এমন অসম্ভাব্য ঘটনাসংঘাত—

"খবরদার!"—শট ক'রে বাসন্তী তার দুটো পা চেয়ারের ভিতর দিকে সরিয়ে নিলে।—"খববদার! পায়ে হাত দেবে না।"

খপ ক'রে চেয়ারের সামনে ব'সে প'ড়ে সুধানাথ বাসন্তীর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল; হাত সরিয়ে নিয়ে কপট কাতরতার সুরে বললে, "পায়ে হাত দেবো কেন দিদিমণি, এতক্ষণ কলেজ থেকে এসেছেন, এখনো জুতো খোলেন নি, তাই ফিতে আলগা ক'রে জুতো দু-পাটি আলতো-আলতো খুলে নিতে যাচ্ছিলাম।"

"না! খুলবে না!"

"তবে আপনিই খুলুন, সাফ ক'রে দিয়ে যাই।"

"না, সাফ করতে হবে না!"

হতাশভাবে সুধানাধ বললে, "তবে থাক্।" উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন কাজ আছে দিদিমণি?"

টেবিলের উপরে রাখা আধ-খাওয়া জলের গ্লাসটা দেখিয়ে বাসন্তী বললে, "জলটা ফেলে দিয়ে গেলাসটা ধুয়ে রাখ।"

টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে দরজায় দিকে দু-চার পা এগিয়ে গিয়ে সুধানাথ বললে, "বেঁজায় পিপাসা লেগেছে।" তারপর মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে প'ড়ে সমস্ত জলটা খেয়ে গভীর-তৃপ্তিসূচক কণ্ঠে বললে, "আঃ!"

চিৎকার ক'রে উঠল বাসন্তী, "এঁটো জল কেন খেলে?"

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন মুখে সুধানাথ বললে, "আপনার এঁটো? তাই অত—"

আরও উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করল বাসন্তী, "তাই অত কি? বল! বলতে হবে!"

একটু বিহ্বল ভাবে বাঁ হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে সুধানাথ বললে, "কাজ নেই আর ও-কথায়! যা রাগী মানুষ আপনি। খামখা আরও খানিকটা রেগে যাবেন!" ব'লে প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

"শোন।"

ফিরে দাঁড়িয়ে সুধানাথ বললে, "বলুন।"

"ঐ খাবার ঢাকা রয়েছে। ওটা নিয়ে গিয়ে দয়া ক'রে একটু জল খাও।"

ঢাকা খুলে খাবার তুলে নিয়ে সুধানাথ জিজ্ঞাসা করল, "এও কি পেসাদী?...বাপ রে! চোখ নয় তো যেন অগ্নিকুণ্ড!" ব'লে সুধানাথ ধীরে ধীরে প্রস্থান করলে। মনে মনে ব'লে গেল, অগ্নিকুণ্ড তো নয়, যেন লালপদ্ম।

পরিপাটি ক'রে সমস্ত কাজকর্ম চুকিয়ে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে রাত দশটার সময় সুধানাথ বাড়ি গেল। সারাদিনের বুদ্ধিবিবেচনাদীপ্ত নিরলস নিরবসর পরিচর্যার দ্বারা বাড়ির সকলকে সে গেল খুশী ক'রে; শুধু একটি প্রাণীকে গেল একটু বিস্মিত ক'রে,—আর তার সঙ্গে যেন অতি সূক্ষ্ম আরও একটা কিছু ক'রে, যার ঠিকমতো শব্দরূপ অভিধানে খুঁজে বার করা কঠিন। একটু দুঃখিত ক'রে গেল কি?—না না, নিশ্চয়ই নয়।...তবে কি একটু হতাশ ক'রে গেল? উঁহু, তাও মনে হয় না।

কিন্তু বিস্মিত কেন ক'রে গেল, সে কথা অস্পষ্ট নয়। সকালবেলাকার

অস্বাভাবিক অসংযত প্রগল্‌ভতার শেষে সেই যে ব'লে গিয়েছিল—চোখ নয় তো যেন অগ্নিকুণ্ড, বাড়ি যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত সেই অগ্নিকুণ্ডের উপর সুধানাথ আর একটি বারও দৃষ্টিপাত তো করেই নি, উপরন্তু বাসন্তীর সঙ্গে সমস্ত দিনে একটি কথাও কয় নি, এমন কি, দিদিমণি সম্বোধন পর্যন্ত নয়। অথচ তার সমস্ত কাজগুলি এমন একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে খুঁটিয়ে ক'রে গেছে যে, বাসন্তীর দিক থেকেও কথা বলবার কোনও কারণ ঘটে নি।

মনে মনে বাসন্তী একটু হাসলে, বাবু সায়েবের আবার অভিমান হ'ল নাকি ?

একটু সকাল সকালই বই বন্ধ ক'রে আলো নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

আশ্চর্য কাণ্ড! সংসারের আকাশে এ ধূমকেতু অকস্মাৎ কোথা থেকে এল কে জানে !

৪

পরদিন বাসন্তী কলেজ থেকে এলে বিজয়া বললে, "নিমাই আজ আসে নি বাসু।"

এ সংবাদে হিসেবমতো যতটা খুশী হওয়ার কথা, বাসন্তী ঠিক ততটা হ'ল না ; বললে, "একদিনেই তা হ'লে লীলাখেলা শেষ হ'ল ?"

"তা নয় রে। শরীর খারাপ হয়েছে, তার দাদাকে পাঠিয়েছে।"

"কি নাম দাদার ?"

"নিতাই।"

নাম শুনে বাসন্তী মনে মনে হাসলে। আজ তা হ'লে প্রভু নিত্যানন্দের পালা অভিনীত হবে! বললে, "নিমাইয়ের দাদার বয়েস কত মা ? বুড়ো মানুষ ?"

"বুড়ো মানুষ কি রে? একই বয়েস, ওরা দুই যমজ ভাই।"

বাসন্তীর মুখে শ্লেষসূচক হাসি দেখা দিলে; বললে, "আচ্ছা মা, এই যমজ ভাইয়ের গল্প তোমার বিশ্বাস হয়?"

বিজয়া বললে, "কেন, বিশ্বাস না হবার কি আছে? মানুষের যমজ সন্তান কি হয় না? তোর বাবা খুঁতখুঁতে মানুষ, সতীশকে আজও বিজয়বাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বিজয়বাবু বলেছেন—নিতাই আর নিমাই দুজনে যমজ ভাই-ই বটে।"

এক মুহূর্ত পরে বললে, "আচ্ছা বাসু, আমাদের সকলেরই তো মন পরিষ্কার,—তোর মনেই বা এত সন্দেহ কেন?"

বাসন্তী মুখে বললে, "বোধ হয় বাবার মতো আমিও খুঁতখুঁতে ব'লে।" মনে মনে বললে, সন্দেহ কেন, সে কথা খুলে বললে নিমাইকে যদি বা বাড়ি-ছাড়া না কর, আমাকে কলেজ-ছাড়া নিশ্চয়ই করবে।

ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বাসন্তী দেখলে, দরজা ভিতর থেকে হুড়কো-লাগানো। বাসন্তীর বাবা শশাঙ্কশেখর আর দাদা সতীশ দুজনেই অফিসে, ছোট বোন হৈমন্তী স্কুলে, বউদি সুলেখা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছুদিন থেকে বাপের বাড়ি আছে, সুতরাং সরল হিসাবে ঘরের ভিতর প্রভু নিত্যানন্দ ভিন্ন আর কারোরই থাকার কথা নয়।

খুটখুট ক'রে কড়া নেড়ে বাসন্তী ডাক দিলে, "নিত্যানন্দ!"

ভিতর থেকে সুধানাথ বললে, "আজ্ঞে দিদিমণি!"

"দোর খোল।"

হড়াৎ ক'রে হুড়কো খোলার শব্দ হয়ে দোর খুলে গেল। দেখা গেল, সুধানাথের নাক-মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা, হাতে লম্বা ঝুলঝাড়া।

সুধানাথ বললে, "দোরটা হাওয়ায় খালি খুলে যাচ্ছিল ব'লে হুড়কো

লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আপনি মিনিট দশেক অন্য কোথাও বসুন দিদিমণি, আমি ঝেড়েঝুড়ে সব সাফ ক'রে দিচ্ছি।"

মিনিট দশেক পরে সুধানাথই বাসন্তীকে ডেকে নিয়ে এল। ঘরে প্রবেশ ক'রে বাসন্তীকে প্রশ্ন করলে, "কেমন দিদিমণি, ঘর আপনার পছন্দমতো পরিষ্কার হয়েছে ?"

অস্বীকার করলে কেউ বিশ্বাস করবে না। ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত, মায় আসবাবপত্র ঝকঝক করছিল। বাসন্তী স্বীকারও করলে না, অস্বীকারও করলে না ; বললে, "কিন্তু আমার বই-খাতাপত্র উল্‌টে-পাল্‌টে রাখ নি তো ?"

সুধানাথ নিঃশব্দে অল্প একটু হেসে বললে, "না, তা রাখি নি। বরং আপনার যা উল্‌টে-পাল্‌টে ছিল, সাবজেক্ট (subject) মিলিয়ে ঠিক ক'রেই রেখেছি। কিন্তু সে আপনি পরে দেখবেন অখন। একটা কথা বলি আপনাকে। মাকে বলেছি, নিমাইয়ের শরীর খারাপ,—কিন্তু আসলে সে কথা ঠিক নয়। আসবার তার অত্যন্ত আগ্রহ, কিন্তু ভয় পায় আসতে।"

"কেন ?"

"বলে—দিদিমণি চেহারায় তো খাসা দেখতে, কিন্তু ভারি রাগী মানুষ, কথায় কথায় ফোঁস ক'রে রেগে ওঠেন।"

মাথা নেড়ে বাসন্তী বললে, "না নিতাই, আসল কথা তা নয়। মাকে তুমি যে কথা বলেছ, আসলে সেই কথাই ঠিক। কাল গঙ্গা থেকে এক কলসী জল এনে নিমাইয়ের কাঁধ টাটিয়েছে।"

সুধানাথ হাসতে লাগল। বললে, "রীতিমতো ডন-বৈঠক-কুস্তি করা শরীর, চার কলসী জল আনলেও কাঁধ টাটায় না।"

বাসন্তী বললে, "টাটিয়েছে কি টাটায় নি, একবার নিমাইয়ের কাঁধ

ভাল ক'রে টিপে দেখলেই বুঝতে পারবে। ব্যথা থাকলে 'উঃ' ক'রে উঠবে।"

সুধানাথ বললে, "আচ্ছা, আজ রাত্রে বাড়ি গিয়ে টিপে দেখে কাল এসে আপনাকে জানাব।"

বাসন্তীর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল; বললে, "এ পরীক্ষার জন্যে বাড়ি যাবার দরকার নেই। আমার সামনেই নিতাইয়ের ডান হাত আর নিমাইয়ের কাঁধ দুই-ই রয়েছে, নিতাই টিপলে নিমাই যদি 'উঃ' ক'রে ওঠে, তা হ'লেই বোঝা যাবে টাটিয়েছে।"

সুধানাথ হাসতে লাগল। বললে, "ধন্য দিদিমণি, ধন্য আপনার বাক্‌পটুতা! আসলে কিন্তু এ বাক্‌পটুতার মূল্য এক কানাকড়িও নয়। নিমাইয়ের মুখে শুনেছি, নিতাই আর নিমাই একই লোক—এই ভুল ধারণা আপনাকে পেয়ে ব'সে আছে। কিন্তু আজ তো আর সে ধারণা থাকা উচিত নয়,—আজ তো বিজয়লালবাবুর কাছ থেকে দাদাবাবু জেনে এসেছেন, নিতাই আর নিমাই আমরা দুজন যমজ ভাই।"

বাসন্তী বললে, "তোমার বিজয়লালবাবু একটি বুজরুক।"

"কিন্তু কোনদিন যদি অবিকল একরকম মূর্তি নিয়ে আমরা দুই যমজ ভাই আপনার সামনে এসে দাঁড়াই, সেদিন বিজয়লালবাবুর সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রত্যাহার করবেন তো?"

"শুধু প্রত্যাহারই করব না, ঘাট স্বীকার ক'রে নাক-কান মলব।"

সুধানাথের মুখে উল্লাসের নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল; দৃঢ়স্বরে বললে, "বেশী সময় নিচ্ছি নে, মাত্র পাঁচ দিন। আজ বৃহস্পতিবার,—আসছে মঙ্গলবারের মধ্যে, আপনাকে ঘাট স্বীকার করাব তা নিশ্চয় বলছি নে, আপনার ভুল ভাঙাব।"

"আর, ভুল ভাঙাতে যদি না পার, তা হ'লে?"

"তা হ'লে যে দণ্ডই আপনি দেবেন মাথা পেতে নোব, মায় প্রাণদণ্ডর চেয়ে মর্মান্তিক—এ বাড়ি থেকে অন্তরিত হওয়ার দণ্ড।"

"কিন্তু শোন, তুমি তো নিতাই দাস, আকাশে চিন্তা ওড়াবার অভ্যাস তোমার আছে। ওড়াবার উপক্রমও করছ। কিন্তু দোহাই তোমার, মঙ্গলবার পর্যন্ত এ অভ্যাস স্থগিত রাখ।"

সুধানাথের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল; বললে, "ক্ষেপেছেন! এখন তো আপনি আমার মনিব, মনিবের সম্বন্ধে কখনো আকাশে চিন্তা ওড়াতে আছে? মনের গহনে ছেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়।"

বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীপূজা ব'লে পূজা সারতে বিজয়ার কিছু বিলম্ব হয়েছিল,—ডাক শোনা গেল, "নিতাই!"

"যাই মা।"—ব'লে সুধানাথ তীরবেগে প্রস্থান করলে।

সুধানাথ প্রস্থান করার পর ক্ষণকাল বাসন্তী চিন্তানিমগ্ন মনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর মনে মনে বললে, তুমি যে নিতাই দাস অথবা নিমাই দাস নও, সে কথা তোমার গেঞ্জির কল্যাণে বিশ্বাস করি; —আর তোমার মতো দুর্দান্তভাবে দুঃসাহসী মানুষ যে বাজে লোক হবে না, সে কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

সুধানাথের গেঞ্জির ঘাড়ে মার্কিং ইংক্ দিয়ে একটা 'সু' অক্ষর লেখা ছিল। অনেক সময়ে এমনি সু-যোগেই ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। নিতাই দাস নামের মধ্যে সুধানাথ নিজের নামকে লুকিয়ে রেখে আত্মগোপনের কৌশল করেছিল, কিন্তু মহকৌশলী দৈব যে তার কাঁধে একটি ক্ষুদ্র 'সু' অক্ষর চাপিয়ে তার সমস্ত কৌশলকে বানচাল করবার ব্যবস্থা করেছিল, তা সে খেয়াল করে নি।

৫

বৃহস্পতি এবং শুক্র—দু দিনই নিতাই দাসের জোর পালা চলল। এ আসরে নিমাই দাস একেবারে অচল। নিতাই দাস মাঝে মাঝে এমন পালা গায় যে, অত-যে দুর্ধর্ষ বাসন্তী চ্যাটার্জি, তারও হৃদয় অজানা আতঙ্কে দুরদুর করতে থাকে। নিতাইয়ের বচনে-বাচনে কথায়-বার্তায় অব্যর্থ ইঙ্গিত, অথচ না করা যায় তার প্রতিবাদ, না করা চলে তাকে পরিপাক। এমনই অদ্ভুত তার বাঁধন-ছাদন যে, তর্ক তুললে কিছুতেই দাঁড় করানো যাবে না যে, বাসন্তীই সে সমস্ত ইঙ্গিতের লক্ষ্য।

শুক্রবার। বেলা তখন তিনটে। গা-ধোবার জন্যে বিজয়া স্নানঘরে প্রবেশ করেছে; হৈমন্তী স্কুল থেকে ফেরে নি; এক রাশ বাসন নিয়ে পাঁচী ঝি কলতলায় ব্যস্ত। ঝাঁটা হস্তে বাসন্তীর ঘরে প্রবেশ করলে সুধানাথ।

একটা বইয়ের ওপর চোখ রেখে বাসন্তী বোধ করি তারই জন্য অপেক্ষা করছিল; বললে, "ঝাঁটা রাখো।"

বিস্মিতকণ্ঠে সুধানাথ বললে, "কেন বলুন তো?"

"আগে রাখো, তারপর বলছি।"

অগত্যা ঝাঁটাটা মেঝেতে রেখে উৎসুক কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "বলুন।"

তীক্ষ্ণ নেত্রে সুধানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বাসন্তী বললে, "দেখ, তুমি নিতাই দাসও নও, নিমাই দাসও নও, তা আমি নিঃসংশয়ে জানি। কে তুমি, খুলে বল। কিসের জন্যে এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম? বুঝতে পারি, এ পরিশ্রমে তুমি অভ্যস্ত নও। কিসের জন্যে তোমার এই তপস্যা?"

সুধানাথ বললে, "তপস্যা তো মানুষ বর পাবার জন্যে করে।"

অধীর কণ্ঠে বাসন্তী বললে, "দেখ, কথা দিয়ে কথা ঢাকবার মতলব ছাড়। কে তুমি সত্যি ক'রে বল। তুমি সামান্য নও, সাধারণ নও, তা আমি শপথ ক'রে বলতে পারি। তুমি আমাকে বিপন্ন করবে না, বিড়ম্বিত করবে না, তা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। তোমার পরিচয় দাও।"

বিমূঢ়কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "এই দেখুন! নিজেই নিষেধ ক'রে আবার নিজেই চিন্তা ওড়াবার হুকুম দিচ্ছেন!"

"হ্যাঁ, হুকুম দিচ্ছি। ওড়াও তোমার মনের চিন্তা আকাশে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে সুধানাথ বললে, "ধরুন, যদি বলি, আমি এক রাজপুত্র, অচিন দেশের রাজকন্যার সন্ধান পেয়ে অচিনপুরীতে নোকরি নিয়েছি;—তা হ'লে?"

"তা হ'লে অচিনপুরীর রাজকন্যা তার মহামান্য অতিথির যথাসাধ্য একটু সেবা করবে।"—চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাসন্তী বললে, "ব'স আমার আসনে।"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "সেটা কি রাজপুত্রের পক্ষে বীরোচিত হবে?"

"ব'স, ব'স—ব'স।"

চেয়ারে ধীরে ধীরে বসতে বসতে সুধানাথ বললে, "বাপ রে! সাধে কি নিমাই কাছে আসতে ভয় পায়!"

কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে সুধানাথের হাতে দিয়ে বাসন্তী বললে, "খাও।"

করুণনেত্রে বাসন্তীর দিকে চেয়ে সুধানাথ বললে, "শুধু জল?"

"আচ্ছা, একটু মিষ্টি নিয়ে আসি।"—ব'লে বাসন্তী দোরের দিকে

অগ্রসর হয়েছে, এমন সময়ে সদর-দরজায় কড়া বেজে উঠল। সুধানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সে বললে, "হৈমন্তীর কড়া নাড়া।"

সুধানাথ চিৎকার ক'রে উঠল, "আসি ছোড়দিমণি।" তারপর এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের জলটা শেষ ক'রে বললে, "যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি মিষ্টি।"— তারপর দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে।

৬

শনিবারে বাসন্তী কলেজ থেকে ফিরলে সুধানাথ বললে, "বিধাতার বিচার দেখেছেন দিদিমণি ?"

টেবিলের উপর বই রাখতে রাখতে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, বিধাতা আবার কি বিচার করলেন ?"

"তপস্যা করলাম আমি, আর বর পেলেন আপনি। চমৎকার বিচার নয় ?"

কৌতূহলী হয়ে বাসন্তী বললে, "তার মানে ?"

"তার মানে, আজ সকালে দুজন লোক এসে আপনার বরের ব্যবস্থা পাকা ক'রে গেছে, মায় চব্বিশ তারিখে বিয়ের দিন পর্যন্ত।"

বাসন্তী কোন কথা না ব'লে বইগুলো জায়গায় জায়গায় গুছিয়ে রাখতে লাগল।

সুধানাথ ব'লে চলল, "আগ্রহ দেখে রাগও হয়, খুশীও হই। আপনার ফোটো দেখেই কাত; বলে—মেয়ে আর না দেখলেও চলে।…পাত্রের নাম অমৃতনাথ চাটুজ্জে। এক পয়সা পণ নেবে না। সেটা এমন কিছু বাহাদুরির কথা নয়,—যে বস্তু পাচ্ছে, হাজার দশেক টাকা সেলামি দিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।…দিদিমণি!"

কোন কথা না ব'লে বাসন্তী চেয়ে দেখলে।

"খাবার আর জল খেয়ে নিন।"

"এখন খাব না।"

"তা হ'লে জুতো জোড়া খুলে দিন, সাফ ক'রে রাখি।"

"ও-কাজ তোমাকে আর করতে হবে না।"

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে দুঃখিত স্বরে সুধানাথ বললে, "ওই কাজটাতেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতাম; আজ না হয় শেষ বারের মতো ওটা করতে দিন।"

সুধানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বাসন্তী বললে, "শেষ বারের মতো কেন?"

"রাজকন্যা এ বাড়ি থেকে চ'লে গেলে, কি নিয়ে এ বাড়িতে রাজপুত্র থাকবে, বলুন?"

এ কথার পর আর কোন কথা হতে পারলে না, সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সুধানাথ দ্রুতপদে প্রস্থান করলে এবং ক্ষণকাল পরে হৈমন্তীর সঙ্গে ফিরে এল।

হৈমন্তীকে দেখে বিস্মিত হয়ে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলে, "এরই মধ্যে এলি যে হৈম?"

হৈমন্তী বললে, "কাল রাত্রে সেক্রেটারি মারা গেছেন, ছুটি হয়ে গেল।" তারপর উৎফুল্ল মুখে বললে, "সুখবর শুনেছ দিদি? চব্বিশে তোমার বিয়ে।"

সুধানাথ এগিয়ে এসে বললে, "মা পূজো করছেন, আমি দিদিমণিকে সব বলেছি।"

হৈমন্তী বললে, "পাত্রের তুলনা নেই। যেমন রূপে, তেমনি গুণে, তেমনি অর্থে। ম্যাট্রিক থেকে এম. এস-সি. পর্যন্ত সব পরীক্ষায়

প্রথম। আই. এ. এস. পরীক্ষা দিয়েছে। ওরা বলছিল—সে পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার না যদি করে, তার একমাত্র কারণ হবে প্রথম স্থান অধিকার করা।"

সুধানাথ বললে, "সবই ভাল, নামটা কেমন যেন বুড়োটে বুড়োটে—অমিরতি মুখুজ্জে।"

হৈমন্তী বললে, "অমিরতি মুখুজ্জে, না, অমিরতি জিলিপি!"

সুধানাথ ও হৈমন্তী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

শনিবার। সকাল সকাল অফিস থেকে শশাঙ্কশেখর ও সতীশ ফেরার পর একটা প্রবল আনন্দের হিল্লোলে সমস্ত বাড়িটা হিল্লোলিত হতে লাগল। আজ বাড়িতে সত্যই রূপকথার এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী অভিনীত হয়েছে।

পরদিন বাসন্তীর সঙ্গে দেখা হতে সুধানাথ বললে, "নিতাই আজ এল না দিদিমণি—আমাকে পাঠিয়ে দিলে।"

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"ওর মন ভাল নেই। ও বোধ হয় আর কাজ করবে না। কিন্তু আমি করব। মাঝে মাঝে তো আপনাকে এ বাড়িতে দেখতে পাব। আর, দেখুন—"

সুধানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বাসন্তী বললে, "কি?"

"আপনার বিয়েতে আমি কিন্তু একজোড়া ধুতি, একটা জামা, আর একজোড়া জুতো নোব—হুঁ! তা কিন্তু ব'লে রাখনু!"

পরদিন সন্ধ্যার পর টেবিল-ল্যাম্প জেলে একটা বই খুলে বাসন্তী সবেমাত্র পড়তে বসেছে, এমন সময়ে হৈমন্তী এসে বললে, "সুখবর আছে দিদি। পাটনা থেকে পাত্রের মামার চিঠি এসেছে।"

হৈমন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বাসন্তী বললে, "কি সুখবর ?"

"অমৃতনাথ সত্যিই একটু বুড়োটে নাম। পাত্রের কিন্তু ওটা ডাকনাম —আসল নাম সুধানাথ।"

সুধানাথ! বাসন্তীর মুখে কেউ যেন সহসা আনন্দের সুইচ নীচু ক'রে দিলে।

"সুখবর নয় ?"

প্রসন্নমুখে বাসন্তী বললে, "হ্যাঁ ভাই, সত্যিই সুখবর।"

এই সু-খবর পাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সুধানাথকে একান্তে পেয়ে বাসন্তী বললে, "শোন নিমাই।"

"বলুন দিদিমণি।"

"কাল যেন নিতাই দাস নিশ্চয়ই আসে।"

"কেন বলুন তো ?"

"তার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।"

সুধানাথ বললে, "আচ্ছা, তাকে আসতে বলব।···কিন্তু দিদিমণি, কাল মঙ্গলবার,—কাল তো আমাদের দু ভাইয়েরই আসবার কথা আছে।"

হাসি চেপে বাসন্তী বললে, "আচ্ছা, দু ভাইয়েই এস।"

মঙ্গলবার। বাসন্তী কলেজ থেকে ফেরার পর সুধানাথ তার কক্ষে প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে আজ আসতে বলেছিলেন দিদিমণি ?"

বাসন্তী বললে, "হ্যাঁ। কই, নিমাই আসে নি ?"

কপট বিষন্নতার সুরে সুধানাথ বললে, "না, আসে নি। ভেবে দেখলাম তার না আসাই ভাল। আমরা দু' ভাই আজ না এলে

আপনি তো আমাকে দণ্ড দেবেন। ভেবে দেখলাম, দণ্ড পেয়ে বাসন্তীহীন বাড়ি থেকে নির্বাসিত হওয়াই ভাল।"

বাসন্তী বললে, "আচ্ছা, দণ্ড দেওয়া না-দেওয়ার কথা পরে ভাবলে চলবে, উপস্থিত তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।"

"কি কথা বলুন।"

"চব্বিশ তারিখে আমার বিয়ে, জান তো ?"

"জানি।"

"সেদিন তোমার আসা চাই-ই।"

বিমূঢ় কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "আমি সেদিন কেমন ক'রে আসব ?— আমি তো সেদিনের পালায় কেউই নই !"

মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে বাসন্তী বললে, "তা আমি জানি নে। অনাহূত, রবাহূত, বরের বন্ধু, বরের চাকর—যে ভাবেই হোক, তোমার আসা চাই। সুধানাথ মুখুজ্জে অমৃতনাথ মুখুজ্জে, ও-সব আমি বুঝি নে,— আমি সেদিন তোমার গলাতেই মালা দোব।"

বিস্ময়ের কণ্ঠে সুধানাথ বললে, "আমার গলাতে মালা দেবেন ? "

বাসন্তী বললে, "হ্যাঁ, দোব। তুমি যে শেষ পর্যন্ত আমাকে বিপদে ফেলবে না, সে বিশ্বাস আমার ছিল—আর তোমার গেঞ্জির পিছন দিকে লেখা 'সু'-অক্ষর বরাবর সে বিষয়ে আমাকে ভরসা দিয়েছে।"

একটা উৎকট কৌতুকের তাড়নায় সুধানাথের মুখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ; স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বললে,"আচ্ছা বাসন্তী, চব্বিশ তারিখে তুমি আমাকে মালা দিয়ো—উপস্থিত আজ তোমার দক্ষিণ হাতখানি আমাকে দাও।"

আরক্তস্মিত মুখে বাসন্তী তার ডান হাতখানা সুধানাথের দিকে এগিয়ে দিলে।

আশ্বিন, ১৩৬০

সবুজ মাঠ

১

বেলা তখন সাড়ে আটটা। একটা প্রয়োজনীয় কাগজ খুঁজে বার করবার জন্য দিলীপ তার কাগজ-পত্রের চামড়ার বাক্সটা তোলপাড় করছে। এমন সময়ে অমিতা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

অপাঙ্গে অমিতাকে একবার দেখে নিয়ে মনে মনে বেশ-একটু খুশী হয়ে দিলীপ বললে, "এস অমিতা, ব'স।" তার পর পুনরায় নূতন উৎসাহে কাগজ অন্বেষণের কার্যে প্রবৃত্ত হ'ল।

পাশের একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে অমিতা বললে, "তোমাকে অভিনন্দিত করতে এলাম দিলীপদা।"

অন্বেষণ-কার্যে লিপ্ত থেকেই দিলীপ এ কথার উত্তর দিলে; বললে, "কেন, চাকরি পেয়েছি ব'লে?"

অমিতা বললে, "হ্যাঁ, সেই জন্যেই।"

মৃদু হেসে দিলীপ বললে, "ব্যবসা করলাম না, বাণিজ্য করলাম না—সেই চিরন্তন চাকরির খাতায় নাম লিখিয়ে 'ভবদীয় অনুগত ভৃত্য' হলাম, এর জন্যে আমাকে তিরস্কৃত না ক'রে অভিনন্দিত করতে এসেছ অমিতা? যাই বল না কেন, আমি কিন্তু তোমার রুচির সুখ্যাতি করতে পারলাম না।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে অমিতা বললে, "তবুও আমি তোমাকে অভিনন্দিত করছি। বিলেত থেকে এসে ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিতে না দিতে দিন-দশেকের মধ্যে একেবারে দেড় হাজার টাকা মাইনে—একে তুমি 'ভবদীয় অনুগত ভৃত্য' বল? ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছিলে,

কিন্তু শুনছি, কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসাপতি সুরেশ রায় তোমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে হেন চেষ্টা-চরিত্র নেই, যা করছেন না।"

কাগজপত্র নাড়তে নাড়তে ঈষৎ গভীর স্বরে দিলীপ বললে, "সে কথাও শুনেছ? কার কাছে শুনলে? সুরেশ রায়ের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ওয়ার্কস ম্যানেজারের কাছে?"

মৃদু হেসে অমিতা বললে, "তা ছাড়া আর কার কাছে শুনব?"

সুরেশ রায়ের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার বিমল অমিতার বড় ভাই এবং দিলীপের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দিলীপ বললে, "চেষ্টা-চরিত্রের কথা কি রকম শুনছ, শুনি?"

অমিতা বললে, "শুনছি, সুরেশ রায়ের আবেদন মঞ্জুর হ'লে তুমি পাবে হাজার পঞ্চাশ টাকার যৌতুক। আর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার ঘটক-বিদায় পাবেন চীফ ওয়ার্কস ম্যানেজারের পদ। দুই বন্ধুরই হবে জয়-জয়কার।"

একটু চুপ ক'রে থেকে দিলীপ বললে, "সে কথা একশো বার সত্যি। লোভনীয় প্রস্তাব! শুনে পর্যন্ত মনটা সর্বদা কেমন যেন খুশী-খুশী হয়ে আছে। ভাবছি কি জান অমিতা?"

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি, জিনিসপত্র আর নগদ টাকায় পঞ্চাশ হাজার টাকা না নিয়ে সব টাকা নগদে নিলেই ভাল হয়। নগদ টাকা যত সহজে সুদ প্রসব করতে পারে, জিনিসপত্র তত সহজে পারে না।"

"তার মানে?"

"তার মানে, নগদ টাকা সরাসরি ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া চলে; কিন্তু চেয়ার-টেবিল ব্যাঙ্কে জমা দিতে হ'লে প্রথমে তা বিক্রি ক'রে নগদ টাকায় পরিণত করতে হয়। অর্থাৎ—"

সহসা দিলীপ থেমে গেল, অর্থাৎ বলবার আর সময় হ'ল না। ব্যস্ত হয়ে সে একটা লম্বা খাম খোলবার অভিপ্রায়ে খামের কাটা মুখের উপর ফুঁ দিতে লাগল।

অমিতা বললে, "অর্থাৎ—কি ? বললে না ?"

খামের ভিতর থেকে এক খণ্ড কাগজ বের ক'রে প্রসন্ন মুখে দিলীপ বললে, "অর্থাৎ, বেঁচে গিয়েছি। যা খুঁজছিলাম, তা পেয়েছি। না পেলে হয়েছিল আর কি ! এখনি দেরাজগুলোও হাতড়াতে হ'ত।"

অমিতা বললে, "তুমি কিন্তু ভারি অগোছালো মানুষ দিলীপদা !"

দিলীপ বললে, "চিরকাল। এ বদ অভ্যেস আর গেল না। দেখ বরাতক্রমে সুরেশ রায়ের মেয়ে যদি একটু গোছালো প্রকৃতির হয়, তা হ'লে আমার অগোছালোপনার কতকটা কাটান হতে পারবে।"

অমিতা জিজ্ঞাসা করলে, "সুরেশ রায়ের মেয়েকে তোমার পছন্দ হয়েছে ?"

অল্প একটু চিন্তা ক'রে দিলীপ বললে, "তা হবে না কেন, অপছন্দ হবার তো কিছু নেই, এক ঐ নামটুকু ছাড়া।"

অমিতা বললে, "কেন, মঞ্জরিকা তো বেশ আধুনিক নাম।"

দিলীপ বললে, "হোক আধুনিক, একে চার-অক্ষুরে, তার ওপর ঞ জড়িয়ে একটা যুক্তাক্ষর।"

"তুমি ক-অক্ষুরে নাম পছন্দ কর ?"

"আমি পছন্দ করি তিন-অক্ষুরে নাম। দু-অক্ষুরে নেহাত ছোট, আর চার-অক্ষুরে একটু বড়।"

অমিতা বললে, "মৃণাল তিন-অক্ষুরে নাম,—পছন্দ হয় ?"

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে দিলীপ বললে, "একেবারেই না। ম-এ ঋকার মৃ উচ্চারণ করার মধ্যে বেশ একটু বেগ পেতে হয়।"

"তবে কি রকম তিন-অক্ষরে নাম তোমার পছন্দ ?"

দিলীপ বললে, "এই ধর, নমিতা। খাসা নাম! শান্ত, সহজ, মসৃণ। ডাকতে কেমন মিষ্টি লাগে।"

অমিতা বললে, "বিয়ের আগে মঞ্জরিকা বদলে দিয়ে নমিতা রেখো।"

দিলীপ বললে, "সে যথাকালে যা-হোক একটা ব্যবস্থা করলেই হবে, উপস্থিত তুমি আমার একটু উপকার করবে অমিতা ?"

সকৌতূহলে অমিতা জিজ্ঞাসা করলে, "কি উপকার ?"

"আমার এই অত্যন্ত অগোছালো বাক্সটা গুছিয়ে দেবে ? অদরকারী কাগজপত্রগুলো ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নির্বাসন দিয়ে দরকারীগুলো একটু সাজিয়ে রাখা,—এই আর কি! অর্থাৎ, অফিস আদালতে যাকে weeding of records বলে, ঠিক সেই কাজ। তুমি আমার weeding officer হবে ?"

অমিতা বললে, "এ কাজটা মঞ্জরিকার জন্যে মুলতুবি থাক্ না ?"

মৃদু হেসে দিলীপ বললে, "সে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই,—এ ধরণের কাজ করবার সুযোগ ভবিষ্যতে বহুবার আমি সৃষ্টি করতে পারব। গোছালো জিনিসকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আগোছালো ক'রে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে আমার আছে। করবে ?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে অমিতা বললে, "না দিলীপদা, এ আমি পারব না। কোন্ কাগজ তোমার দরকারী, আর কোন্‌গুলো অদরকারী,— তা আমি কেমন ক'রে বুঝব ?"

দিলীপ বললে, "যেটুকু বুদ্ধি আর বিবেচনা তোমার আছে, তাই দিয়েই বুঝবে। যে-কাগজগুলো অদরকারী ব'লে তুমি বাতিল করবে, আমি জানব সেইগুলোই অদরকারী ; আর যেগুলো তুমি দরকারী ব'লে গুছিয়ে রাখবে, সেইগুলোকেই আমি দরকারী ব'লে মেনে নোব।"

অমিতা বললে, "তা হ'লে বুঝেছি, তোমার সব কাগজই অদরকারী।"

অমিতার কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠে দিলীপ বললে, "না না। সর্বনাশ! বাক্সটা যেন একেবারে উজাড় ক'রে তোমার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে ঢেলে দিয়ো না। অনেক দরকারী কাগজও ওর মধ্যে আছে।"

অমিতা বললে, "তা হ'লে আমি শুধু জুতোর মাপ আর বাজারের ফর্দ-জাতীয় কাগজগুলোকেই অদরকারী সাব্যস্ত ক'রে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলব।"

অমিতার কথা শুনে প্রসন্নমুখে দিলীপ বললে, "তথাস্তু! তাই করলেই হবে।" তার পর বাক্সটা বন্ধ ক'রে চাবির রিং থেকে চাবিটা খুলে অমিতার হাতে দিয়ে বললে, "তুমি বাড়ি পৌঁছবার মিনিট দশেকের মধ্যে রামদীন বাক্সটা নিয়ে গিয়ে তোমাকে দিয়ে আসবে।"

অমিতা বললে, "চাবি আমাকে দিয়ে দিলে, বাক্স খোলবার দরকার হবে না তোমার?"

দিলীপ বললে, "দরকার হ'লে অসুবিধে হবে না, আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে।"

প্রস্থানোদ্যত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে অমিতা বললে, "আমার বিচার কিন্তু নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে।"

দিলীপ বললে, "ষোল-আনা নির্বিচারে গ্রহণ করব।"

অমিতা প্রস্থান করলে একটা দেরাজ থেকে দিলীপ একখানা চৌকো খাম বার করলে। একটা পেপার ক্লিপ দিয়ে খামখানা বন্ধ। তারপর ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে চামড়ার বাক্সটা খুলে সেই খামখানা কাগজপত্রের

অবিন্যাসের এক জায়গায় গুঁজে রেখে বাক্স বন্ধ ক'রে রামদীনকে দিয়ে বাক্সটা অমিতাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে।

২

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর অমিতা নিজ কক্ষে একান্তে দিলীপের বাক্স খুলে বসল। মনের মধ্যে তার অননুভূতপূর্ব উত্তেজনার মৃদু আমেজ। একজন দেড় হাজার টাকা বেতনের উচ্চ কর্মচারীর কাগজপত্রের ভাগ্য নিরূপণের সে আজ চরম নিয়ন্ত্রী। যে কাগজকে সে অপ্রয়োজনীয় ব'লে নিন্দিত করবে, সে কাগজ আজ জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায় অথবা আগুনে ছাই করাও চলে। প্রভুর অধিকারের চতুঃসীমা হতে তার চিরনির্বাসন। যে কাগজকে সে দরকারী ব'লে সাব্যস্ত করবে, অন্তত উপস্থিত মতো বিলোপের হাত থেকে সে কাগজ বেঁচে গেল।

অমিতা তার দু দিকে দুটো পেপার-ওয়েট স্থাপন করলে। ডান দিকের পেপার-ওয়েটের তলায় জমবে দরকারী কাগজপত্র; বাম দিকে অদরকারী। অর্থাৎ ডান দিকে দাক্ষিণ্যের স্বীকৃতি, বাম দিকে বিমুখতার নিদর্শন।

প্রথমেই হাত উঠল লণ্ডনের কোন পুস্তকালয়ের একটা ক্যাশমেমো। অবিলম্বে অমিতা সেটা বাম কাগজ-চাপার তলায় স্থাপিত করলে। অর্থাৎ, ক্যাশমেমো বিতাড়িত হ'ল বাজে কাগজের দ্বীপান্তরে। তারপর উঠল লীডস থেকে লণ্ডনে কোনো বন্ধুকে লেখা চিঠির খসড়া। ক্ষণকাল তার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে অমিতা সেটাকে ডান পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দিলে। অর্থাৎ খসড়া লাভ করলে কাজের জিনিসের ছাপ। এইরূপে দরকারী অদরকারী বাছাই হতে হতে বাম পেপার-ওয়েট যখন

দক্ষিণ পেপার-ওয়েটের চেয়ে ইঞ্চি সাতেক উঁচু হয়ে উঠেছে, তখন হাতে উঠল সেই ক্লিপ দিয়ে আঁটা খাম। মুহূর্তের জন্য মনের মধ্যে দ্বিধা উপস্থিত হ'ল, অমন বিশেষ ভাবে বন্ধ করা খামের ভিতরকার বস্তু তার পক্ষে দেখা উচিত হবে কি না। কিন্তু তখনি মনে হ'ল নির্বাচন করার যে অধিকার দিলীপের কাছ থেকে সে পেয়েছে, তা অকুণ্ঠ, অবারিত,—কোনো প্রকার বিধিনিষেধের দ্বারা তা খণ্ডিত নয়।

ক্লিপ খুলে খামের ভিতর থেকে যে বস্তু নির্গত হ'ল, তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অমিতার মুখ হয়ে উঠল রঞ্জিত, ললাটে কুঞ্চিত রেখা দেখা দিল। নির্নিমেষ নেত্রে ক্ষণকাল কাগজখানার উপর তাকিয়ে থেকে কেমন যেন তার মনে হতে লাগল, এ ফোটো বিবাহিত মেয়ের নিরুদ্বেগ ফোটো কিছুতেই নয়; ফোটো তোলবার সময়ে এর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে দুর্লক্ষ্য আকৃতি আশ্রয় নিয়েছে, তা অবিবাহিত মেয়ের পাত্র-শিকার করবার আকৃতি। ফোটোখানার সামনে অথবা পিছন দিকে কোথাও এমন কিছুই লিখিত নেই, যা থেকে কার ফোটো এবং কবে তোলা, তা বোঝা যায়।

ফোটোগ্রাফখানা খামের মধ্যে পুরে ক্লিপ এঁটে ক্ষণকাল অমিতা নিবিষ্ট মনে কি ভাবলে, তারপর খামখানা দক্ষিণ কাগজ-চাপার তলায় দরকারী কাগজের তাড়ায় রাখতে গিয়ে বাম পেপার-ওয়েটের তলায় চাপা দিলে। অন্যমনস্কভাবে দু-চারখানা কাগজপত্র ছাঁটাই-বাছাই করতে করতে সহসা মুহূর্ত কাল স্তব্ধ হয়ে চিন্তা ক'রে সে বাম পেপার-ওয়েটের তলা থেকে খামখানা পুনরায় বার করলে। তার পর ফোটোর পিছন দিকে সুস্পষ্টাক্ষরে 'নমিতা' লিখে তার পাশে একটি প্রশ্নের চিহ্ন বসিয়ে দিলে। খামের মধ্যে ফোটো পুরে এবার আর বাম পেপার-ওয়েটের তলায় না রেখে দক্ষিণ পেপার-ওয়েটের তলায় স্থাপন করলে।

ছাঁটাই-বাছাইয়ের কাজ একেবারে শেষ হয়ে গেলে অমিতা নির্বাচিত দরকারী কাগজগুলো কয়েকটা শ্রেণী-বিভাগে বিভক্ত ক'রে ফিতা দিয়ে সুচারু ভাবে বেঁধে বেঁধে বাক্সর মধ্যে গুছিয়ে রাখলে।

বাক্স ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সে রামদীনকে বেলা পাঁচটার সময়ে আসতে বলেছিল। যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে রামদীন বাক্স নিয়ে গেল।

৩

সন্ধ্যা তখন সাতটা। অমিতাদের বাড়ি উপস্থিত হয়ে দিলীপের প্রথমেই সাক্ষাৎ হ'ল বিনয়ের সঙ্গে। বিনয় অমিতার ছোট ভাই।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলে, "বিমল কোথায় বিনয় ?"

বিনয় বললে, "দাদা এখনো অফিস থেকে ফেরেন নি।"

বিস্মিত কণ্ঠে দিলীপ বললে, "এখনো ফেরে নি ? মা কোথায় ?"

"মেজদির দেওরের অসুখ, মা দেখতে গেছেন।"

"অমিতা কোথায় ?—সেজদি ?"

এ কথার উত্তর বিনয় না দিয়ে দিলে আর এক জন ; বললে, "সেজদি তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে।"

চকিত হয়ে দিলীপ পিছনে তাকিয়ে দেখে, অমিতা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। দিলীপের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে কোন্ সময়ে সে অলক্ষিতে দিলীপের পিছনে এসে হাজির হয়েছে বোঝা যায় নি।

অমিতা বললে, "চল, ঘরে চল।"

ঘরে গিয়ে উভয়ে একটা গোল টেবিলের দু ধারে সামনা-সামনি দুটো চেয়ারে উপবেশন করলে। কিসের যেন একটা সঙ্কোচ বশত অমিতা দিলীপের সঙ্গে চোখাচোখি এড়াবার জন্য নতনেত্রে টেবিলের

উপরিস্থিত একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। কিন্তু নতনেত্রে থেকেও সে যেন অনুভব করছিল, দিলীপ তার দিকে চেয়ে আছে। একবার চোখ তুলতেই সে দেখলে, শুধু চেয়েই নেই, মুখ টিপে টিপে হাসছে।

হেসে ফেলে অমিতা বললে, "হাসছ যে বড় ?"

দিলীপ বললে, "হাসছি, তোমার দুর্বলতার কথা মনে ক'রে।"

"কেন, কিসে আমার দুর্বলতা দেখলে ?"

স্মিত মুখে দিলীপ বললে, "তোমার 'নমিতা' লেখায়।" তারপর ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগল, "আচ্ছা, লিখলেই যখন 'নমিতা', অত কাছাকাছিই যখন গেলে, তখন একেবারে অমিতা লিখে লক্ষ্যভেদ করবার সংসাহস দেখালে ক্ষতিটা কি হ'ত ?"

ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে অমিতা বললে, "পরের ফোটোয় নিজের নাম লিখব ?"

দিলীপ বললে, "আহা-হা, পরের ফোটোয় কেন লিখবে ? পরের ফোটোটা বাতিল ক'রে ফেলে দিয়ে তোমার নিজের একটা ফোটোয় 'অমিতা' লিখলে কে তোমাকে দোষ দিত ?"

নিমেষের জন্য দিলীপের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে আরক্ত-স্মিত মুখে অমিতা বললে, "মঞ্জরিকা দিত।"

গভীর স্বরে দিলীপ উত্তর দিলে, "সত্যি ! পঞ্চাশ হাজার টাকা মাঠে মারা গেল ! কিন্তু যে-মাঠে মারা গেল, সে-মাঠ ফুল-ফোটা পাখী-ডাকা সবুজ ঘাসের মাঠ।" ব'লে হাসতে লাগল।

আষাঢ় ১৩৫৬

লালীর প্রেম

লালীর প্রেম সম্বন্ধে গল্প লেখা সম্ভব হ'লেও লালীকে কোনও তরুণ-বয়সী লাবণ্যময়ী মানবী মনে করলে ভুল করা হবে। যদিও লালী মানুষের মত দু হাত ঝুলিয়ে সোজা হয়ে বসতে পারে, আর তার গায়ের রঙ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ না হ'লেও কাঞ্চনবর্ণের কাছাকাছি, তবু তার লেজ আছে। সুতরাং সে কুকুর।

আমাদের সংসারে লালী ছাড়া আর একটি মানবেতর প্রাণী আছে। নবদূর্বাদলের চেয়েও গাঢ় সবুজ রঙের টিয়াপাখী ফুলী। লালীর গায়ের রঙ গাঢ় পীতবর্ণ। ও রঙ কালো রঙয়ের চেয়ে লাল রঙের নিকটতর বিবেচনা ক'রেই বোধ হয় লালী নামকরণ হয়েছে।

একটি মেম সাহেব কর্তৃক উপহৃত হয়ে পাঞ্জাবির পকেটে অবস্থান ক'রে লালী যে দিন আমাদের সংসারে প্রবেশ করে, তখন তার চোখ ফোটে নি। কাচের নল মুখে ঢুকিয়ে অতি কষ্টে তাকে দুধ খাওয়াতে হ'ত। নিরতিশয় যত্ন এবং সাবধানতার সঙ্গে 'মানুষ' ক'রে তোলার পর লালী মানুষের মতো কথা কইতে পারলে না বটে, কিন্তু মানুষের মতোই কথা বুঝতে শিখলে। তার কিছু পরে কথা বোঝাতেও শিখলে।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'লে তৎক্ষণাৎ ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাক দিয়ে লালী জানিয়ে দেয় লোক এসেছে, দরজা খোল। দরজা খোলার পর যদি দেখা যায় আগন্তুক বাড়ির লোক অথবা পরিচিত ব্যক্তি, তা হ'লে এক-আধটা ডাক দিয়ে লালী চুপ ক'রে যায়। যদি দেখা যায় আগন্তুক নবাগত অপরিচিত মানুষ, তা হ'লে অপরিচ্ছন্ন বেশের ইতর লোকের ক্ষেত্রে লালী তারস্বরে অবিরাম চিৎকার করতে থাকে ; অর্থ টা—

আগন্তুক ভাল লোক মনে হচ্ছে না, কেউ অবিলম্বে এসে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

আর অপরিচিত আগন্তুক যদি সুবেশ ভদ্রলোক হয়। তা হ'লেও লালী চিৎকার করে, কিন্তু সে চিৎকারের ব্যঞ্জনা অন্য প্রকারের। এটুকু সে বুঝে নিয়েছে যে, অপরিচিত ভদ্রলোক যারা আমাদের গৃহে আসে, তাদের শতকরা পঁচানব্বই জন আমারই সঙ্গে দেখা করতে আসে। সুতরাং তেমন কেউ এলে দোতলার সিঁড়ির নিম্নপ্রান্তে গিয়ে সে ডাকতে আরম্ভ করে; এবং সিঁড়ি ভেঙে আমাকে নামতে দেখলেই ডাকের স্বরটা অনুযোগের সুরে পরিবর্তিত ক'রে নিয়ে যেন বলতে থাকে, কি আশ্চর্য! এত দেরি করতে হয়? ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ব'সে রয়েছেন যে!···তারপর আমার পিছনে পিছনে বৈঠকখানায় প্রবেশ ক'রে আগন্তুকের দেহ শুঁকতে আরম্ভ করে।

মেয়েদের প্রতি লালী সাধারণতঃ একটু কম কঠোর। সে এখনও মেয়ে এবং পুরুষকে সমদৃষ্টিতে দেখতে শেখে নি। সর্ববিষয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের সমকক্ষ বিবেচিত হবার দাবি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অজ্ঞ থাকায় এখনও সে মেয়েদের পুরুষের চেয়ে কিছু কম অনিষ্টকর প্রাণী ব'লে মনে করে—তাই তার ডাকের মধ্যে মৃদুতার একটা বিশেষ আভাস পেলে আমরা কোন অপরিচিতার শুভাগমনের ইঙ্গিত লাভ করি।

লালীর মাস আষ্টেক বয়স কালে একদিন হঠাৎ দেখা গেল সে সামনের দিকের বাঁ পা পাততে পারছে না, তিন পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। কেউ তার পায়ে আঘাত ক'রে থাকবে মনে ক'রে আমরা বাড়িসুদ্ধ সকলে যেমন ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম, সর্বজনপ্রিয় লালীকে কে আঘাত দিতে পারে তার দূরতম অনুমান করতে অসমর্থ হয়ে তেমনি আমরা দুশ্চ্ছেদ্য সমস্যাজালে জড়িয়ে পড়লাম।

খানিকটা সমাধান দেখা দিলে মাস খানেক পরে। একদিন দেখা গেল, লালী তার সামনের দিকের ডান পা-ও পাততে পারছে না,—আর, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা বন্ধ ক'রে কোনো প্রকারে ব'সে ব'সে ঘেঁসটে ঘেঁসটে চলার কাজ সারছে।...তা হ'লে লাঠির ঘা নয়, বাত কিংবা ঐরকম আর কিছু।

পিছনের দুই পায়েও বাত সংক্রামিত হ'লে লালী ব্যাঙের মতো থপ থপ ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে, অথবা আর কি করবে ভেবে আমরা আকুল হয়েছি, এবং আর নিশ্চিন্ত না থেকে চিকিৎসার একটা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সঙ্কল্প করছি, এমন সময়ে গৃহে দেখা দিলেন এক ব্যক্তি, পশু পক্ষী—বিশেষতঃ কুকুর সম্বন্ধে যাঁর কিছু জ্ঞান আছে। তিনি বললেন, "লাঠির আঘাতও নয়, বাতের আক্রমণও নয়, লালী এক বিশেষ জাতীয় জার্মান কুকুর যাদের সামনের পায়ের বাঁকা গঠনই স্বাভাবিক গঠন।"

সে যাই হোক না কেন, লালী যে সত্যই এক বিশেষ জাতের কুকুর একদিন ও তার প্রমাণ দিলে মানুষের মতো খাড়া হয়ে বসতে পারা দেখিয়ে। দেখা গেল, হনুমান অথবা ক্যাঙ্গারু যেমন সোজা হয়ে বসতে পারে ঠিক তেমনিভাবে সামনের দিকের পা দুটোকে একেবারে নড়বড়ে হাতে পরিণত ক'রে শূন্যে ঝুলিয়ে টেবিলের ওপর মাংসাহারে রত ব্যক্তির দিকে লোলুপ নেত্রে চেয়ে উর্ধ্বমুখে লালী খাড়া হয়ে ব'সে আছে। সোজা হয়ে বসবার উপযোগী তার পাছার গড়ন বিশেষভাবে প্রশস্ত এবং সমতল।

সুদীর্ঘ জীবনে কুকুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিতান্ত অল্প নয়; কিন্তু সামনের দিকের পাঁয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষের মতো সোজা হয়ে বসতে-পারা কুকুরের অভিজ্ঞতায় লালীই প্রথম এবং বোধ করি শেষ।

তারের তাঞ্জামে আসীন হয়ে ফুলী যেদিন আমাদের গৃহে প্রবেশ করলে, তখন লালী পনেরো মাসের তাগড়া কুকুর। তার সম্মুখ পায়ের বিকৃতি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। লুব্ধ, ক্রুদ্ধ অথবা উৎসাহিত হ'লে সে তীরবেগে চার পায়ে ছুট মারতে পারে। আহার বিষয়ে তার পছন্দ-অপছন্দ যথেষ্ট। সাত্ত্বিক আহার্যের মধ্যে দধিতে এবং রাজসিকের মধ্যে মাংসে তার প্রচুর রুচি। তবে দধি এবং মাংসের মধ্যে যদি নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে, তা হ'লে অবশ্যই মাংস। রান্নাঘর থেকে যখন মাংস রাঁধার গন্ধ নির্গত হয় তখন লালীর উৎসাহের অন্ত থাকে না।

ফুলীর প্রাত প্রথম দৃষ্টিপাতে লালী তিনবার ডাক দিলে—ঘেউ ঘেউ ঘেউ। আমরা সকলে তার অর্থ করলাম, তুই আবার কোথা থেকে এ বাড়িতে মরতে এলি ?

তৎক্ষণাৎ ফুলী উত্তর দিলে, চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ !—অর্থাৎ তুই একাই যে এ বাড়িতে মরবি, সে কথা তোকে কে বললে ?

লালী বললে, ভেউ !—অর্থাৎ, দূর হ।

ফুলী উত্তর দিলে, চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ !—অর্থাৎ, দূর হব তোর কথায় নাকি ?

লালীর এলাকা গৃহের একতলা। ফুলী স্থান পেলে দোতলার বারান্দার দক্ষিণ কোণে, যার নিম্নে একতলায় লালী সাধারণতঃ ব'সে রোদ পোয়ায়। সেখান থেকে লালী হুঙ্কার ছাড়ে, ঘেউ ঘেউ ঘেউ !

উপর থেকে ফুলী উত্তর দেয়, চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ !

বোঝা গেল তুজনে তুজনকে ভারি অপছন্দ করছে।

ফুলীর ওপর একটু মনোযোগী হলাম। সে যাতে সুপুষ্ট বাছাই-করা ছোলা পায়, প্রতিদিন যাতে তার খাঁচা ধোওয়া হয়, সেই

সঙ্গে যাতে তাকে স্নান করানো হয়, ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে লাগলাম।

টিয়াপাখী কথা কয়। মাস-খানেক ধ'রে সকাল সন্ধ্যা ছু বেলা অধ্যবসায়ের সহিত ফুলীকে পড়াতে লাগলাম, কিষ্টো-রাধা, কিষ্টো-রাধা, কিষ্টো-রাধা! পড় ফুলু—কিষ্টো-রাধা!

কিন্তু অত কষ্ট ক'রে পড়িয়েও কোনো ফল হ'ল না। মিনিট দশেক ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে আমার মুখে কিষ্টো-রাধা শুনে হঠাৎ কোনো এক মুহূর্তে গলাটা সরু ক'রে এগিয়ে দিয়ে ফুলী চিৎকার ক'রে ওঠে,—টিয়া টিয়া টিয়া!

হতাশ হয়ে আমি বলি, ছিয়া ছিয়া ছিয়া! ওরে পাপিষ্ঠ, ছোলা খাবার যম! পাপ মুখ দিয়ে একবারও কি কিষ্টো নাম বেরোল না?

সময়ে সময়ে ফুলী যেন আমার বেদনা বুঝতে পারে। ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ছুই ঠোঁট ফাঁক ক'রে ক্ষণকাল নিঃশব্দে কাটিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ বার করবার উপক্রম করে। যেটুকু বেরোয় তাতে মনে হয়, সে শব্দ যেন মানুষের ভাষার বর্ণমালার অন্তর্গত। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। হঠাৎ এক সময়ে গলা সরু ক'রে চিৎকার ক'রে ওঠে,—টিয়া টিয়া টিয়া!

নিম্নে ক্রুদ্ধ লালীর ডাক শোনা যায়—ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

যদিও ফুলী কিষ্টো-রাধা নামে সাড়া দিতে অসমর্থ হ'ল, মনে হয় লালীর ঘেউ ঘেউ ডাকে সে বিভিন্ন অর্থে সাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। পশুর ডাক পক্ষী বুঝেছে। লালীর ডাকের মধ্যে কি অর্থভেদ ফুলী উপলব্ধি করে তা বোঝা যায় না, কিন্তু প্রতিবাদে কখনো সে করে চ্যাঁ-চ্যাঁ, কখনো চর্‌-চর্‌, কখনো টিয়া-টিয়া, কখনো বা আর কিছু। বোধ করি ওগুলো শাপশাপান্তরের বিভিন্ন মাত্রার ব্যঞ্জনা।

সে যাই হোক, লালী এবং ফুলীর মধ্যে এই প্রকার বৈর-সম্ভাষণ ক্রমশঃ সংখ্যায়, দৈর্ঘে এবং প্রাবল্যে এতটা বেড়ে উঠল যে, সংসারে যৎপরনাস্তি অশান্তি দেখা দিলে। উভয়ে যখন বচসা শুরু করে তখন অমানবীয় কোলাহলের দাপটে বাড়ির লোক অস্থির হয়ে ওঠে। একতলায় লালীর কাছাকাছি যারা থাকে তাদের তো পরস্পরের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য কথোপকথন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বোঝা গেল, উভয়ের মধ্যে কোথাও একটা তীব্র জাতিবিদ্বেষ থাকার জন্য বনিবনার সম্ভাবনা নেই, সুতরাং দুজনকে একত্র রাখা চলবে না। লালী আমাদের গৃহের পুরনো অধিবাসী, তাই সে আমাদের কাছেই র'য়ে গেল। ফুলীকে নিকটস্থ এক আত্মীয়-গৃহে অন্তরিত করা হ'ল। সুদৃশ্য খাঁচার মধ্যে স্বরূপ টিয়াপাখী পেয়ে আত্মীয়রা খুশী হয়ে সেরখানেক ছোলা কিনে এনে মহা উৎসাহে বাছতে ব'সে গেল।

এদিকে শত্রু-নির্বাসনের কল্যাণে লালীর হাঁক-ডাক অনেক ক'মে গেল। ক'মে যাওয়ার চেয়ে থেমে যাওয়ারই কাছ-বরাবর হ'ল। কড়া-নাড়ার শব্দ হ'লে তেমন কোন সাড়া দেয় না। নূতন লোক সামনে পড়লে এক-আধবার ডাক দিয়েই থেমে যায়।

আমরা মনে করি, ফুলীর সঙ্গে চেঁচামেচি ক'রে প্রশ্বাসের অনেক অপব্যয় হয়েছে, তাই দম নিচ্ছে। কিন্তু পাঁচ-সাত দিন পরে খেয়াল হ'ল, শুধু দম নিচ্ছেই না, খাওয়াও অনেক কমিয়ে দিয়েছে। খাদ্যের জন্য বাড়ির গৃহিণীর শাড়ি কামড়ে টানাটানি করা বন্ধ করেছে, দই-মাখা ভাত তো শুঁকেও দেখে না, মাংস দিলে একটুখানি চেটে-চুটে ফেলে রাখে। অধিকাংশ সময়ই তক্তাপোশের তলায় আত্মগোপন ক'রে থাকে। কেউ ডাকাডাকি করলে গোঁ-গোঁ শব্দ ক'রে হয় ভয় দেখায়, নয় বিরক্তি

প্রকাশ করে। কারো কারো চোখে লালীর চোখ সময়ে সময়ে জবাফুলের মতো লাল মনে হয়।

বিবরণ শুনে একজন বন্ধু বললেন, হাইড্রোফোবিয়ার পূর্বলক্ষণ; অপর একজন বললেন, ডিস্‌টেম্পারের।

দুটোই খারাপ। চিন্তিত হয়ে বিলিতী পাস পশু-চিকিৎসক আমাদের এক নাত-জামাইকে তলব করলাম। লালীকে দেখেশুনে যথাসম্ভব পরীক্ষা ক'রে তিনি বললেন, "শারীরিক কোন রোগ মনে হচ্ছে না, সম্ভবতঃ মানসিক ব্যাপার। দুঃখ, অভিমান, ক্রোধ, কিংবা ঐ ধরণের কিছুর কোন ইতিহাস আছে কি?"

একটু ভাবতেই ফুলীর কথা মনে হ'ল। সবিস্তারে তার ইতিহাস জানালাম।

হাসিমুখে নাতজামাই বললেন, "তা হ'লে ঠিক তাই।"

সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ঠিক?"

"কিছু মনে করবেন না তো দাদামশায়?"

"না না, মনে আবার করব কি?"

"অল্পবয়সে দিদিমণি বাপের বাড়ি গেলে আপনার যা হ'ত, ফুলী যাওয়াতে লালীর তাই হয়েছে।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললাম, "বল কি ভায়া!—বিরহ?"

"নির্ঘাৎ। ফুলীকে ফিরিয়ে আনুন, লালী আবার দই-ভাত খেতে আরম্ভ করবে।"

"তবে যে দুজনে দিনরাত ঝগড়া করত?"

"সেটা ঝগড়া, না ওদের ভাষায় প্রেমালাপ, তা কেমন ক'রে জানবেন?"

যথার্থ।

সেই দিনই ফুলীকে আনতে পাঠালাম।

ভেবেছিলাম, আত্মীয়রা হয়তো একটু দুঃখিত হবে। কিন্তু দেখা গেল, ফুলীকে ফেরত পাঠাবার জন্য তারা নিজেরাই ব্যস্ত হয়েছে। ফুলী ভাল ক'রে ছোলা খায় না, ভাল ক'রে ডাকে না, কিষ্টো-রাধা পড়াতে গেলে চ্যাঁ শব্দ ক'রে খাঁচার মধ্যে তেড়ে আসে। এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, দাঁড়ের উপর বসতে পারে না, তলায় ব'সে চোখ বুজে ঝিমোয়।

ফুলীকে এনে বৈঠকখানার মেঝেয় বসানো হ'ল। লালী ব'সে ছিল তক্তপোশের তলায়। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে খাঁচার পাশে উপবেশন করল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলী টপ ক'রে দাঁড়ের ওপর উঠে বসল। তারপর তাদের সম্ভাষণ আরম্ভ হয়ে গেল।

এখন যেন আমরা ওদের ভাষা কতকটা বুঝতে আরম্ভ করেছি।

লালী ডাকলে, ঘেউ ঘেউ ঘেউ!
অর্থ যেন, তোমারে ছাড়িয়া
থাকিতে পারে কি কেউ!
ফুলী উত্তর দিলে, টিয়া টিয়া টিয়া!
অর্থাৎ, তাই তো আবার
ফিরিয়া এসেছি প্রিয়া!

লালীর প্রতি প্রিয়া অপপ্রয়োগ নয়। কারণ লালী গোত্রে কুকুর হ'লেও জাতিতে কুক্কুরী,—অর্থাৎ মাদী। আর হিন্দীতে একটা প্রবচন আছে—বুড্‌ঢা তোতা নহি পঢ়তা হ্যায়; অর্থাৎ বৃদ্ধ পাখী পড়া পড়ে না। ফুলী যখন কিষ্টো-রাধা পড়লে না তখন সে বুড্‌ঢা তোতা, সুতরাং মদ্দা।

আশ্বিন ১৩৬১

বেচুলাল

১

তের শো ষোল সালের আশ্বিন মাসের সকাল।

উমানাথ স্মৃতিরত্ন চলেছেন গৌরীদীঘির জমিদার-বাড়িতে গৃহদেবতা রাধাবল্লভজীর নৈত্যিক পূজার জন্য। বংশানুক্রমে উমানাথরা গৌরীদীঘির জমিদারদের কুল-পুরোহিত।

জমিদার-বাড়ি যাওয়ার সোজা পথ পরিত্যাগ ক'রে উমানাথ আজ একটু ঘুরে চলেছেন কৈবর্তপাড়ার পথ ধ'রে। গত ভাদ্র মাসের শেষের দিকে দিন-তুইব্যাপী নিরবসর ঝড়বৃষ্টির ফলে তাঁর গোহাল-বাড়ির একটা ঘর একেবারে পড়-পড় হয়েছে। বিপিন কৈবর্তের দ্বারা অবিলম্বে সেটার মেরামতের ব্যবস্থা করা দরকার।

বিপিনের গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উমানাথ দেখলেন, পনেরো-ষোল বৎসর বয়সের একটি নধর কৃষ্ণবর্ণ বালক উবু হয়ে ব'সে নিবিষ্ট মনে একটা বৃহৎ বাঁশের ডালার তুই পাশে দড়ি বাঁধবার কার্যে রত। মনে হ'ল, গত বৎসর বর্ষাগমের পূর্বে ঘর ছাইবার সময়ে এই ছেলেটিই যেন একদিন বিপিনের সঙ্গে তাঁর গৃহে গিয়ে নানা প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি করেছিল।

বালকটির দিকে অল্প একটু অগ্রসর হয়ে উমানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ রে, তুই তো বিপিনের ছেলে?"

নিমেষের জন্য মুখ তুলে আগন্তুককে এক চাহন দেখে নিয়ে পুনরায় নিজের কার্যে নিবিষ্ট হয়ে বালক বললে, "তাই।"

"তাই মানে?"

"তাই মানে—এ তাই নয়।" ব'লে বালকটি দুই হাতে তালি দিয়ে কোন্ তাই নয়, তা দেখিয়ে দিলে।

বালকটির ধরণ-ধারণে মনে মনে ঈষৎ পুলকিত হয়ে উমানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে, তাই মানে কি ?"

"তাই মানে বিপিনের ছেলে।"

মৃদু স্বরে উমানাথ বললেন, "বাপ রে! দুর্দান্ত নৈয়ায়িকের পাল্লায় পড়লাম দেখছি!"

উমানাথের কথা বুঝতে না পেরে বালকটি বললে, "কি বলছ, বুঝতে পারছি নে। জোরে বল।"

উমানাথ বললেন, "বলছি, কি নাম তোর ?"

"আমার নাম বিন্দে।"

"বিন্দে, মানে বিনোদ তো ?"

"তা বলতে পারি নে, সবাই বলে বিন্দে।"

"আচ্ছা বিন্দেই সই। বাড়ি থেকে তোর বাপকে ডেকে নিয়ে আয় দেখি শীগ্গির।"

দুই দিকের বাঁধনের দড়ি সমান দীর্ঘ হ'ল কি না পরীক্ষা ক'রে দেখতে দেখতে বিনোদ বললে, "বাপ বেরিয়ে গেছে, বাড়ি নেই।"

বিপিন বাড়ি নেই শুনে ঈষৎ দুঃখিত হয়ে উমানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় বেরিয়েছে রে ?"

"জানি নে।"

"কোন্ দিকে গেছে ?"

"জানি নে।"

"কখন আসবে ?"

"জানি নে।"

নিরবচ্ছিন্ন "জানি নে"র পাষাণ-প্রাচীর ভেদ ক'রে কোন পরমার্থ লাভের আশা নেই বুঝে উমানাথ স্থির করলেন, উপস্থিত প্রস্থান করাই শ্রেয়—প্রত্যাবর্তনের সময়ে না-হয় এই পথে আর একবার বিপিনের সন্ধান ক'রে যাবেন।

উমানাথকে প্রস্থানোদ্যত দেখে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বিনোদ বললে, "ও ঠাকুর, চ'লে যাচ্ছ কেন? সকালবেলা এসেছ, আমার বেচুলালকে আশীর্বাদ ক'রে যাও।"

ফিরে দাঁড়িয়ে কতকটা বিরক্তিসহকারে উমানাথ বললেন, "কে তোর বেচুলাল?"

বিনোদ বললে, "বা রে! আমার বেচুলালকে জান না? ডাকছি, দেখ, কে আমার বেচুলাল।" তারপর দু হাতের দু জোড়া আঙুল মুখের মধ্যে পূরে সজোরে শিস্ দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলে, "আয় বেচু-উ-উ! আয়, আয়, আয়!"

পর-মুহূর্তে শোনা গেল, বহু দূর হতে, বিপিনের গৃহের পিছন দিকের বাগান থেকেই হয়তো বা, কি যেন একটা কিছু উঠি-তো-পড়ি ক'রে অতি দ্রুতগতিভরে খড়বড়-খড়বড় রবে ছুটে আসছে। গৃহের অন্তরালে থেকে দৃষ্টিপথে নির্গত হ'লে বোঝা গেল, সেটা মিশ কালো রঙের ক্ষুদ্রকায় কোনো এক পশু;—বিনোদের নিকট উপস্থিত হয়ে তার চতুর্দিকে ঘিরে ঘিরে লাফাতে লাফাতে যদি না বার-দুই ব্যা-ব্যা ক'রে ডাক ছাড়ত, তা-হ'লে ছাগলছানার পরিবর্তে কুকুরছানা ব'লে ভুল করলে উমানাথের পক্ষে খুব বড় রকমের ভুল হ'ত না।

দু হাত দিয়ে ছাগল-ছানাটাকে কোলে তুলে নিয়ে উমানাথের দিকে এগিয়ে ধ'রে বিনোদ বললে, "এই আমার বেচুলাল। এখন বুঝলে

বেচুলাল কে ?" তারপর সামনের পা দুটো দিয়ে বেচুলালকে বাগিয়ে ধ'রে নীচু হয়ে উমানাথের দিকে অগ্রসর হ'ল।

সভয়ে হাত-দুই পিছিয়ে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে উমানাথ বললেন, "ওরে, ছুঁস নে, ছুঁস নে। চান ক'রে পুজোয় চলেছি।"

উমানাথের সম্মুখে ভূমির উপর বেচুলালের মাথাটা চেপে ধ'রে বিনোদ বললে, "নে, বামুন মানুষকে গড় কর্ বেচু,—ভাল হবে তোর।" তার পর উমানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বলতে লাগল, "আশীর্বাদ করছ না কেন ঠাকুর? অশীর্বাদ কর। বলো—বেচু তুই সুখে থাকবি, রাজা হবি, তোর একশো বছর পেরমাই হবে। বলো।"

অনেকবার অনেককে উমানাথ আশীর্বাদ করেছেন, কিন্তু ছাগলছানাকে "রাজা হবি" ব'লে আশীর্বাদ করবার প্রস্তাব জীবনে এই প্রথম। কখনো যদি ছাগলছানাকে আশীর্বাদ ক'রে থাকেন তো স্বর্গে যাবার আশীর্বাদই করেছেন,—এবং তা কেবলমাত্র বলিদানের মন্ত্রপাঠের কালে।

উমানাথকে নির্বাক থাকতে দেখে ব্যগ্রকণ্ঠে বিনোদ বললে, "কি ঠাকুর, চুপ ক'রে রইলে কেন? আশীর্বাদ করো!"

বিরক্তি-মিশ্রিত স্বরে উমানাথ বললেন, "আরে, করেছি, করেছি। থাম্ তুই।"

ছাগলটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে বিনোদ বললে, "করেছ? কই, শুনতে পেলাম না তো! মনে মনে করেছ বুঝি? আচ্ছা, তা হ'লেও হবে। হাজার হোক, বামুন মানুষ তো।"

"বিন্দে!"

উমানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিনোদ বললে, "কি?"

"ছাগলটা বেচবি?"

"কাকে ?"

"ধর্, আমাকে ?"

উমানাথের দিকে ছাগলটা একটু দুলিয়ে বিনোদ বললে, "মাইরি চাঁদ! আমি বেচুলালকে বেচি, আর তুমি ওকে কেটে ওর মাংস রেঁধে খাও!" তার পর পূর্বোল্লিখিত ডালাটার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বললে, "এটা কি জান? এটা বেচুলালের গাড়ি। এতে চ'ড়ে বেচুলাল হাওয়া খেয়ে বেড়াবে।" তারপর বেচুলালকে চেপে ডালার ভিতর বসিয়ে দিয়ে বললে, "চুপটি ক'রে ব'সে থাক্ বেচু, কোনো ভয় নেই। চল্, তোকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনি।"

কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল, এ অভয়-প্রাপ্তি কোনো উপকারেই এল না। দড়ি ধ'রে বিনোদের একবার একটু টান দেওয়া, আর, ভয়েই হোক অথবা উৎসাহেই হোক, টপ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে পরিষ্কার একটি লাফ দিয়ে বেচুলালের উমানাথের পায়ের কাছে গিয়ে পড়া!

এই অতর্কিত বিপদের কোন হিসেব উমানাথ মনের মধ্যে রাখেন নি। তিনি হিসেব করেছিলেন, ডালার ছাগল ডালাতেই থাকবে। চমকে উঠে "এই" ব'লে সহসা পিছন হটতে গিয়ে একটা খালে পা প'ড়ে পড়তে-পড়তে কোন রকমে সামলে গেলেন। রোষ-প্রজ্বলিত নেত্রে বিনোদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "অর্বাচীন! বেল্লিক কোথাকার!" তার পর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে দ্রুতবেগে জমিদার-বাড়ির দিকে পদচালনা করলেন। একটা আধ-ক্ষেপাটে ছেলে এবং একটা আহ্লাদে ছাগলের গুণে যে-স্থান মারাত্মকরূপে অনিশ্চিত, সেখানে আর মুহূর্ত মাত্র অবস্থান করা নিরাপদ মনে করলেন না।

পিছনে শোনা যাচ্ছিল বিনোদের সহাস্য উল্লাস,—"হি-হি-হি! আর একটু হ'লে বেচু ছুঁয়ে দিয়েছিল ঠাকুরকে! হি-হি-হি! আর

একটু হ'লে ঠাকুর প'ড়ে যেত হোঁচট খেয়ে! বেশ হ'ত তা হ'লে! বেরিয়ে যেত বেচুর মাংস খাবার লোভ! হি-হি-হি!"

ক্রোধের সঙ্গে একটা বিস্ময়জনক হীনতার বোধ যুক্ত হয়ে উমানাথকে বিহ্বল ক'রে রেখেছিল। কি আশ্চর্য! তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর ধর্মপরায়ণতা, তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি তাঁর বয়সের প্রাচীনতা ও পবিত্র বেশ, কিছুতেই রক্ষা করতে পারলে না তাঁকে একটা অভদ্র অশিষ্ট বালকের এমন লঘু আচরণ থেকে!

দ্রুতপদে খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পর উমানাথ দেখলেন, সম্মুখে বিপিন আসছে।

নিকটে এসে আভূমি নত হয়ে উমানাথকে প্রণাম ক'রে বিপিন বললে, "ঠাকুর মশাই আজ যে এদিকের পথে চলেছেন?"

কালো মেঘে বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় উমানাথের গম্ভীর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল,—"তোর বাড়িই গিয়েছিলাম বিপিন। সেখানে এক জোড়া আজব জিনিস দেখে এলাম।"

গভীর কৌতূহলে বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, "কি বলুন তো?"

"একটা ছাগল আর একটা পাগল।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বিপিন বললে, "ছাগল তো বুঝলাম বেচুলাল, কিন্তু পাগল?"—তারপর সহসা মুখমণ্ডলে সমস্যামোচনের নিশ্চিন্ততা ফুটিয়ে ব'লে উঠল, "ও-হো-হো! বুঝেছি। বিনুদেকে বলছেন। তা ঠিকই ধরেছেন ঠাকুর মশাই,—পাগলই বটে। ভাই-বোন তো কেউ আর নেই, বেচুলালকেই ও ভাইয়ের মতো ভাবে। দুজনে কথা কয় ঠাকুর মশাই। ছাগলে ঘাড় নেড়ে 'না' বলে, 'হ্যাঁ' বলে—এ কথনো শুনেছেন? কিন্তু সে কথা যাক্, আপনার শ্রীচরণের ধুলো প'ড়ে আমার বাড়ি পবিত্তির হয়েছে। কোনো আদেশ আছে না কি?"

উমানাথ তাঁর প্রয়োজন ব্যক্ত করলেন। ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁর গোয়ালের একটা অংশ বে-মেরামত হয়েছে; অপরাহ্নে উমানাথের গৃহে গিয়ে দেখেশুনে বলতে হবে, মেরামতের জন্য ক'টা বাঁশ এবং অপরাপর কোন্ কোন্ উপকরণ সংগ্রহ করা দরকার।

বিপিন প্রতিশ্রুত হ'ল, উমানাথের আদেশমতো যথাকালে সে উপস্থিত হবে।

২

গৌরীদীঘির তরুণ জমিদার বিজয়নারায়ণ টাইফয়েড রোগের দুর্দান্ত আক্রমণ থেকে সম্প্রতি সেরে উঠেছে। তিন মাস যাবৎ যমে-মানুষে টানাটানির পর শেষ পর্যন্ত যমরাজকেই পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে। রোগের বাড়াবাড়ির মুখে যে বড় ডাক্তার এবং দুজন অভিজ্ঞ নার্স চিকিৎসা ও সেবার জন্য কলিকাতা থেকে গৌরীদীঘিতে এসেছিল, নিরাপত্তার এলাকায় রোগী প্রবেশ করবার পর তারা কলিকাতায় ফিরে গেছে। এখন শুধু রোগীকে চাঙ্গা ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় চিকিৎসকের দ্বারা যৎসামান্য চিকিৎসা এবং পথ্য নিয়ন্ত্রণের পালা চলেছে।

সকালে পূজা-আহ্নিকের পর বিজয়নারায়ণের বিধবা মাতা ভুবনেশ্বরী সন্ত-রোগমুক্ত পুত্রের মাথায় নির্মাল্যের ফুল-বিল্বপত্র স্পর্শ করিয়ে সবে মাত্র একতলায় নেমেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকা মানদা সংবাদ দিলে, উমানাথ স্মৃতিরত্ন দর্শনপ্রার্থী।

হাতের ফুল-বিল্বপত্র যথাস্থানে স্থাপন ক'রে ভুবনেশ্বরী বললেন, "এখনো পূজোয় বসেন নি তিনি?"

মাথা নেড়ে মানদা বললে, "না, বসেন নিক। বোধ করি আগে আপনকার সাথে কথা কইবার চান।"

বহিঃপ্রাঙ্গণের উত্তর ভাগে রাধাবল্লভজীর মন্দির। তথায় উপস্থিত হয়ে ভুবনেশ্বরী প্রথমে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সাষ্টাঙ্গে বিগ্রহকে প্রণাম করলেন; তার পর এসে যুক্তকরে উমানাথকে নমস্কার ক'রে বললেন, "কিছু বলবেন স্মৃতিরত্ন মশায় ?"

প্রতিনমস্কার ক'রে উমানাথ বললেন, "এবার ঋণচ্ছেদ করবার সময় উপস্থিত হয়েছে, সেই কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মা-জননী।"

বিজয়নারায়ণের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর থেকে গৌরীদীঘির আবালবৃদ্ধ জনসাধারণ ভুবনেশ্বরীকে 'মা-জননী' ব'লে সম্বোধন করে।

উমানাথের কথা ভুবনেশ্বরী সহসা ঠিক ধরতে পারলেন না। প্রচুর শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রভূত চারিত্রিক গুণগ্রামের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে উমানাথের মনের মধ্যে অপারমার্থিক বস্তুনিচয়ের প্রতি ঈষৎ লোভাতুরতাও যে একটু জায়গা দখল করেছিল, সে কথা তাঁর অবিদিত ছিল না। মনে করলেন, উমানাথ বুঝি নিজের পাওনা-গণ্ডা সম্বন্ধেই একটু ঘোরালো ধরণের গৌরচন্দ্রিকা করছেন। ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের ঋণ বলুন তো ?"

সহাস্য মুখে উমানাথ বললেন, "দেবতার ঋণ। বিজয়নারায়ণের আরোগ্যলাভের ব্যাপারে কলকাতা থেকে যে ডাক্তার এসেছিলেন, তাঁর কৃতিত্বকে একটুও খর্ব করছি নে; কিন্তু তিনি নিমিত্ত মাত্র, হেতু নন। হেতু দেবতার অনুগ্রহ।"

কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে ভুবনেশ্বরী বললেন, "তা আর বলতে! হাজার বার সে কথা সত্যি।"

উমানাথ বললেন, "প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়ে আপনি ডাক্তারদের সন্তুষ্ট করেছেন, এবার দেবতাকে সন্তুষ্ট করুন। বিজয়নারায়ণের আরোগ্য কামনায় আপনি রক্ষাকালী-মাতার পূজার মানত করেছিলেন,—আগামী অমাবস্যার রাত্রে সেই পূজার ব্যবস্থা করবার কথা বলছিলাম।"

বিজয়নারায়ণের অসুখের সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে, যখন ব্যাধির অগ্রগতির বিরুদ্ধে মানুষের চেষ্টা প্রবল বন্যার সামনে বালির বাঁধের মতো নিষ্ফল হতে আরম্ভ করেছিল, উমানাথের পরামর্শেই ভুবনেশ্বরী রক্ষাকালী পূজার মানত করেছিলেন। তাঁর নিজের মনের গুপ্ত প্রদেশে কিন্তু এ বিষয়ে দ্বিধার একটা সামান্য গাঁট বর্তমান ছিল। ভুবনেশ্বরীর পিতৃবংশ শাক্তমতাবলম্বী। বিবাহের কালে শ্বশুরও ছিলেন তাই। কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসর পরে বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গিয়ে দৈবক্রমে এক-জন বৈষ্ণব সাধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হরিনারায়ণ সস্ত্রীক বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং গৌরীদীঘিতে প্রত্যাবর্তনের পর মন্দির নির্মাণ ক'রে রাধাবল্লভজী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে হরিনারায়ণ কঠিন রোগে পীড়িত হ'লে ভুবনেশ্বরী রক্ষাকালী পূজার মানত করবার জন্য প্রলুব্ধ হন। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। কুমারী অবস্থায় একবার তাঁর পিতা, এবং আর একবার তাঁর এক পিতৃব্য-কন্যা কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। উভয় ক্ষেত্রেই রোগের চরম অবস্থায় রক্ষাকালী পূজা মানত করবার পর রোগীরা আরোগ্য লাভ করে।

হরিনারায়ণ কিন্তু এসকল যুক্তি এবং নজিরে আদৌ কর্ণপাত করেন নি। ভুবনেশ্বরীর হাত ধ'রে বলেছিলেন, "ধর্মমতের জন্যে প্রাণত্যাগ করা যায় ভুবন, কিন্তু প্রাণের জন্যে ধর্মমত ত্যাগ করা যায় না। তা ছাড়া, রাধাবল্লভজী কি দিশী ডাক্তার, আর রক্ষেকালী সাহেব ডাক্তার যে, বিপদ দেখলে রাধাবল্লভজীকে ত্যাগ ক'রে

রক্ষেকালীর শরণাগম হতে হবে? বাঁচবার যদি হয়, রাধাবল্লভজীই আমাকে রোগমুক্ত করবেন।”

রাধাবল্লভজী অবশ্য হরিনারায়ণকে মুক্ত করেছিলেন, তবে রোগ থেকে নয়, ভব-যন্ত্রণা থেকে।

এ সকল ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সংযোগের কোনো সত্য স্বীকার করতে হয়তো মন ঠিক চায় না, তথাপি রক্ষাকালী পূজা মানতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়া ও স্বামীর মৃত্যু,—এই দুই অনতিবর্তনীয় ঘটনা মাঝে মাঝে একত্রে মিলিত হয়ে ভুবনেশ্বরীর মনে ক্ষোভ উৎপাদন করতে ছাড়ে না। তাই বিজয়নারায়ণের জীবনের সঙ্কটকালে পুনরায় রক্ষাকালী পূজা মানতের প্রস্তাব হ'লে, সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে ভুবনেশ্বরীর দ্বিধা হয়তো কিছু হয়েছিল, কিন্তু বিলম্ব হয় নি। ধর্মমত রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করা যত সহজ, একমাত্র পুত্রের করা তত সহজ নয়।

উমানাথের প্রস্তাবের উত্তরে ভুবনেশ্বরী বললেন, “কিন্তু অমাবস্যার তো আর মোটে দিন আষ্টেক বাকি, এর মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে উঠবে তো?”

ভুবনেশ্বরীর কথা শুনে উমানাথ হাসতে লাগলেন; বললেন, “লক্ষ্মীর ঘরে আবার ব্যবস্থার ভাবনা! এক, প্রতিমা আর পাঁঠা ছাড়া আপনার সংসারে আর কোন্ জিনিসের ব্যবস্থা নতুন ক'রে করতে হবে বলুন তো? নিতাই কুমোরকে ব'লে দিলে দিন-চারেকের মধ্যে প্রতিমা গ'ড়ে দেবে; আর পাঁঠার ব্যবস্থা? সে যেন মা নিজেই ক'রে রেখেছেন বিপিন কৈবর্ত্তের ঘরে। কালো রঙের নধরদেহ একটা ছাগ-শাবক এইমাত্র দেখে এলাম। সারা দেহ খুঁজলে বোধ হয় একটা সাদা লোম পাওয়া যাবে না।”

ছাগ-শাবকের প্রসঙ্গে ভুবনেশ্বরীর মুখমণ্ডলে একটা অতি ক্ষীণ ছায়া

দেখা গেল; বললেন, "ছাগ-বলি কি কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না স্মৃতিরত্ন মশায়?"

স্মিতমুখে উমানাথ বললেন, "এ বিষয়ে আলোচনা তো পূজা মানত করবার সময়েই আপনার সঙ্গে বিশদভাবে হয়ে গেছে মা-জননী। যে দেবতার যা আহার তা তো সে দেবতাকে দিতেই হবে। ছাগল ঘাস খায় ব'লে বাঘকে ঘাস খেতে দিলে বাঘ সন্তুষ্ট হবে কি? আপনাদের বাড়িতে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে দিশী হাকিম এলে লুচি-মণ্ডা খাইয়ে সন্তুষ্ট করা হয়। কিন্তু ইংরেজ হাকিম এলে তাঁকে তো মদ-মাংস দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয় মা-জননী।"

যুক্তি জোরালো। এক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা ক'রে ভুবনেশ্বরী বললেন, "তা হ'লে ব্যবস্থাই করুন। নিতাইকে প্রতিমা গড়তে ব'লে দিন।"

খুশী হয়ে উমানাথ বললেন, "আজই তাকে ডাকিয়ে পাঠাব। বিপিনও আজ ও-বেলা আমার কাছে আসবে, পাঁঠাটার কথাও ব'লে রাখতে হবে।"

"যে দাম বিপিন চাইবে, তার ওপরও কিছু তাকে পাইয়ে দেবেন। সে যেন অসন্তুষ্ট না হয়।"

"বিপিন অসন্তুষ্ট হবে না। তবে তার একটা পনের-ষোল বছরের আধ-পাগলা ছেলে আছে, সেটা একটু গোল না বাধায়।"

"কেন?"

"ওই ছাগলটা নিয়ে সে পাগল হয়ে আছে।"

শুনে ভুবনেশ্বরীর মুখে ঈষৎ কাতরতার চিহ্ন দেখা দিল; বললেন, "আহা! তা হ'লে নাই-বা নিলেন ছেলেমানুষের আদরের জিনিস। অন্য ছাগলের সন্ধান করলেই তো হয়।"

ভুবনেশ্বরীর কথা শুনে উমানাথ হাসতে লাগলেন; বললেন, "এখনও

তো গোল বাধায় নি। যদি গোল বাধায় তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে। এ সামান্য কথার জন্যে আপনি ভাববেন না মা-জননী।”

৩

অপরাহ্ণে কিন্তু বিপিনের কাছে কথাটা পেড়ে উমানাথ নিজেই একটু ভাবিত হলেন। ধীরে-ধীরে মাথা নাড়তে-নাড়তে বিপিন বললে, “বিন্‌দে কিছুতেই রাজী হবে না ঠাকুর মশাই। এ কথা শুনলে সে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করবে। তা নইলে, দেবতার ভোগে লাগবে, আপনি আদেশ করছেন, মা-জননীকে কথাটা জানানো হয়েছে, ছাগল তো আমার বিনা পয়সাতেই দেওয়া উচিত। কিন্তু ও তো শুধু ছাগলই নয়, ও যে বেচুলাল।”

অপ্রসন্ন স্বরে একটু তিরস্কারের ভঙ্গীতে উমানাথ বললেন, “তোর যেমন বুদ্ধি, তেমনি কথা! বেচুলাল নাম দিলে ছাগল যদি ছাগলের বাড়া আর কিছু হয়, তা হ’লে হীরেলাল নাম দিলে মানুষ মানুষের বাড়া আর কিছু হবে না কি?”

এই কুট তর্কের ঘোরালো যুক্তির মর্মভেদ করতে অসমর্থ হয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক’রে বিপিন বললে, “সে কথা একশ’ বার সত্যি।”

“তবে?”

“কি বলি বলুন দেবতা! আমি তো বুঝি, কিন্তু ছেলে যে বেজায় অবুঝ! সে বুঝবে কি?”

“অবুঝ ছেলের অন্যায় আবদারের কাছে দেবতার মাহাত্মিকে ছোট করবি? ছেলের আবদারই শুধু দেখনি, আর তার কল্যাণ-অকল্যাণ দেখবি নে?”

ছেলের কল্যাণ-অকল্যাণের কথায় বিপিনের মনে একটা যেন আতঙ্কের ছায়া দেখা দিলে। ওই তো একমাত্র ছেলে, সবে ধন নীলমণি। শেষ পর্যন্ত কি ওই ছেলে নিয়ে দেবতার রোষে পড়বে! এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থানের পর আভূমি নত হয়ে উমানাথকে প্রণাম ক'রে বললে, "আচ্ছা ঠাকুর মশাই, ছেলেকে রাজী করাতেই হবে। কাল আপনার গোয়ালের বাঁশ ফেলবার সময়ে পাকা খবর দিয়ে যাব।"

বিপিনের মনে দ্বিধার যেটুকু অবশেষ থাকতে পারে অর্থের দ্বারা সেটুকুকেও অপসারিত করবার উদ্দেশ্যে উমানাথ বললেন, "ছাগলটা কত দিয়ে কিনেছিলি বিপিন ?"

"হরিপুরের হাট থেকে আট আনায় কিনেছিলাম ঠাকুর মশাই। মাস খানেকের ছ্যানা। তখন এই এতটুকু ছিল।" ব'লে বিপিন বাঁ হাতের অল্প একটু উপরে ডান হাত রেখে আকারের ক্ষুদ্রত্ব নির্দেশ করলে। "দুধ আর দুধ-ভাত খাইয়ে-খাইয়ে বিন্‌দে মাস সাত্তেকে কি চেহারা ওর করেছে, তা তো সকালে আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। অমন লক্ষণমন্ত পশু হাজারে একটা পাওয়া যায় না ঠাকুর মশাই। কি সুডোল দেহ, কি চমৎকার রঙ! অতখানি শরীরে একটা সাদা রোঁয়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না,—না কপালে, না ন্যাজে।"

"এখন ওর দাম কত হতে পারে ?"

"যদি বেচি ?"

"যদি বেচিস ?"

এক মুহূর্ত গভীর ভাবে হিসাব ক'রে মাথা নাড়া দিয়ে বিপিন বললে, "তা, ট্যাকা আড়াই বে-ওজোর।"

ট্যাঁক থেকে কয়েকটি টাকা বার ক'রে উমানাথ বিপিনের হস্তে অর্পণ করলেন। বোধ করি বিপিনকে দেবার উদ্দেশ্যেই টাকাগুলো ট্যাঁকে ছিল।

সামনের দিকে হাত একটু কাত ক'রে ধ'রে টাকাগুলোর সংখ্যা দেখে নিয়ে সবিস্ময়ে বিপিন বললে, "এ কি ?"

উমানাথ বললেন, "ছাগলের দাম।"

"এখন কেন ?"

"তা হ'লেই বা। তুই তো আর টাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস নে !"

"আর এতই বা কেন ? পাঁচ টাকা ?"

"মা-জননীর হুকুম, তোকে বেশী ক'রে দেবার।"

যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে ভুবনেশ্বরীর উদ্দেশে প্রণাম ক'রে বিপিন বললে, "তাঁর দয়া। কিন্তু এখন থাক্ ঠাকুর মশাই,—আগে হুজুরে ছাগল জমা করি, তার পর যা-হয় দেখা যাবে।" ব'লে টাকাগুলো উমানাথের সম্মুখে ভূমির উপর স্থাপন করলে।

মাথা নেড়ে উমানাথ বললেন, "তা হবে না বিপিন, টাকা তোল্।"

কোনো উত্তর না দিয়ে বিপিন হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু উমানাথের নির্বন্ধাতিশয্যে টাকাগুলো তুলতেই হ'ল। তার মতো গরিবের পক্ষে পাঁচ-পাঁচ টাকার লোভ সম্বরণ করা সহজ কথা নয়। তখনকার দিনের পাঁচ টাকা আজকালকার কুড়ি টাকার সমান।

আর একবার উমানাথকে প্রণাম ক'রে বিপিন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলে। কোমরে তখন তার টাকার গরম, আর মনের মধ্যে বিনোদকে কেন্দ্র ক'রে একটা মন-দমানো অস্বস্তির গ্লানি।

৪

বিপিন যখন গৃহে পৌঁছল, তখনো বিনোদ বেড়িয়ে বাড়ি ফেরে নি। সুযোগ বুঝে সেই অবকাশে সে তার স্ত্রী শুকতারাকে সকল কথা ব'লে মতামত জানতে চাইলে, "তুই কি বলিস তারা ?"

নগদ পাঁচ টাকা মূল্য শুকতারাকে যথেষ্ট আলোড়িত করেছিল, কিন্তু তদপেক্ষা তার কাছে গুরুতর মনে হয়েছিল পুত্রের অকল্যাণের আশঙ্কার কথা। বললে, "মা-কালীর পূজোর জন্যে পুরুত ঠাকুর চেয়েছে, কি বলব বল! দিতেই হবে।"

"ছেলেকে সামলাতে পারবি ?"

"সামলাতেই হবে।"

ক্ষণকাল পরে বেচুলালকে নিয়ে বিনোদ যখন বাড়ি ফিরল তখন শুকতারা ভাত চড়িয়েছে ; আর মুক্ত অঙ্গনে একটা চেটাই পেতে বিপিন নিদ্রা ও জাগরণের সীমান্তরেখা অতিক্রম করবার চেষ্টায় আছে।

"বাবা !"

বেচুলালের খুর-ধ্বনিতেই চট্‌কা ভেঙে গিয়েছিল। চক্ষু উন্মীলিত ক'রে বিপিন বললে, "কি বাবা ?"

"আজ বেচু আর একটা কথা বলেছে।"

"কি কথা ?"

"আমি বললাম, বেচু, বাড়ি যাবি ? আমার দিকে তাকিয়ে বেচু বললে, বো-বো। বো-বো মানে কি জানিস ? যাব।"

সহসা বিপিনের মাথায় একটা বুদ্ধি দেখা দিলে। কপট আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করলে, "পষ্টো বললে না কি রে ?"

"পষ্টো বললে।"

এবার বিপিনের কণ্ঠস্বরে একটা যেন ভীতির আমেজ ফুটে উঠল ; বললে, "তা হ'লে, এ তো ভাল কথা নয় বিন্‌দে।"

"কেন ?"

"ও ছাগল কার ?"

"কার আবার ? আমার।"

"ছাগলে কথা কইলে যার ছাগল তার বাবা মারা যায়।"

মনে মনে এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বিনোদ বললে, "তুই তা হ'লে মারা যাবি ?"

বিনোদের কথার ভঙ্গীতে সুবিধার কিছু সম্ভাবনা আশা ক'রে যথাসম্ভব করুণ কণ্ঠে বিপিন বললে, "তা মারা যাব বইকি।"

"মারা যাবি, না, হাতী হবি !"

বেচুলালকে তার খোঁয়াড়ে রেখে এসে বিপিনের পাশে উপবেশন ক'রে বিনোদ বললে, "এ কথা আগে বলিস নি কেন ?"

বিপিন বললে, "আগে তো জানতাম না, আজই শুনলাম।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভেবে বিনোদ বললে, "বেচুলাল কথা কয় না, ডাকে। কখনো বো-বো করে, কখনো ব্যা-ব্যা করে। ব্যা-ব্যা কি কথা ? কথা নয়।

বিপিন বললে, "আর কখনো কখনো যে উঁহু উঁহু করে, তার কি ? উঁহু-উঁহু তো কথা।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে বিনোদ চুপ ক'রে রইল। বেচুলাল যে সময়ে সময়ে উঁহু-উঁহু ক'রে কথা কয়, একাধিক বার তার প্রমাণ সে বেচুলালকে দিয়ে অনেকের কাছে দিইয়েছে।

বিনোদের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য ক'রে উৎসাহিত হয়ে বিপিন বললে, "এক কাজ করলে হয় বিন্‌দে।"

"কি ?"

"সগ্‌গো কাকে ব'লে জানিস ?"

"জানি।"

"কি বল্‌ দেখি ?"

উর্ধ্ব দিকে হাত দেখিয়ে বিনোদ বললে, "আকাশ।"

"আকাশ সগ্‌গোর পাঁচিল। আকাশের আড়ালে সগ্‌গো আছে। অনেক পুণ্যি করলে তবে সগ্‌গে যাওয়া যায়। সগগো ভারি ভাল জায়গা, দুঃখ-কষ্ট কিছুই সেখানে নেই। এ তুই জানিস বিন্‌দে ?"

"জানি।"

"আচ্ছা, বেচুলালকে সগ্‌গে পাঠালে কেমন হয় ? তা হ'লে আমিও বেঁচে থাকি, আর বেচুলালও সগ্‌গে গিয়ে সবুজ-সবুজ ঘাস আর নধর-নধর লতাপাতা খেয়ে খুশী হয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়।"

"কি ক'রে সগ্‌গে পাঠাবি ?"

প্রশ্ন কঠিন। কিন্তু বিপিন জানত এ প্রশ্নের উত্তর কোন এক সময়ে তাকে দিতেই হবে। বললে, "আমাদের রাজাবাবুর অসুখ ভাল হয়েছে ব'লে অমাবস্যার রেতে রক্ষাকালী-মার পূজো হবে। সেই পূজোর জন্যে ছিঁতিরত্নো মশাই ছাগলটা চেয়েছে।"

"কি করবে ছাগল নিয়ে ? বলি দেবে ?"

"তা না দিলে বেচুলাল সগ্‌গে যায় কেমন ক'রে তা বল্‌! মা-কালীর কাছে বলি দিলে তবে তো তার পুণ্যি হবে।"

"ছাগল কথা কইলে বাপ মারা যায়, এ কথা তোকে কে বলেছে ?"

বলে নি তো কেউই। বিনোদকে ভয় পাওয়ার জন্য কথাটা বিপিনের নিছক মিথ্যা রচনা। কিন্তু কথাটার সঙ্গে একজন বিশিষ্ট লোকের নাম যোগ করতে পারলে কথাটা অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এই লোভে বিপিন বললে, "ছিঁতিরত্নো মশাই বলেছে।"

সহসা একটা সংশয়ের তাড়নায় বিনোদের চক্ষু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, "ছিঁতিরত্নো মশাই কে ?"

একটু বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে বিপিন বললে, "সে কি রে ? ছিঁতিরত্নো মশাই তো আজ সকালে আমাদের বাড়ি এসে তোর সঙ্গে কত কথা ক'য়ে গেছে।"

আর যায় কোথায়! সংশয়ের নিরসন মাত্র ঠিক যেন একটা বোমার মতো অকস্মাৎ বিনোদ ফেটে পড়ল।

"ঐ আঁটকুড়ীর বেটা ছিঁতিরত্নো বেচুর মাংস খাবার লোভে তোকে মিথ্যে কথা ব'লে ভয় দেখিয়েছে। সকালবেলা ও বেচুকে কেনবার কথা বলছিল। এবার কোনদিন সে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে ওকে ঢিল-পেটা করব।"

বিনোদের পিঠে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে বোলাতে বিপিন বললে, "ছি বাবা, বামুন মানুষ,—ও-কথা বলতে নেই। আমরা আট আনা দিয়ে ছাগলটা কিনেছিলাম, আর দেখ্ দেখি ছিঁতিরত্নো মশাই তোকে কত দাম দিয়েছে।—পাঁচ টাকা!" ব'লে দক্ষিণ করতলে টাকাগুলো স্থাপন ক'রে বিনোদের দিকে আগিয়ে ধরলে।

"ও আঁটকুড়ীর পো! তুই তা হ'লে ছাগল বিক্রি ক'রেই এসেছিস?" ব'লে ছোঁ মেরে টাকাগুলো বিপিনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দূরে পেয়ারা-তলায় সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিনোদ উচ্ছলিত হয়ে লাফিয়ে উঠল।

উদ্বিগ্ন হয়ে বিপিন বললে, "রাগ করিস নে বিনদে, কোথায় যাচ্ছিস? আমার কাছে একটু বোস্।"

ফিরে দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে বিনোদ বললে, "গলা টিপে বেচুকে মেরে ফেলব, তবু বলি দিতে দেব না।" তারপর অস্থির পদে শুকতারার নিকট উপস্থিত হয়ে বললে, "শুনছিস মা! বাবাটা বেচুলালকে বিক্রি করতে চায়!"

শুকতারা তখন ভাত সম্পূর্ণ সিদ্ধ হ'ল কি না পরীক্ষা ক'রে দেখছিল। কোমল স্বরে বললে, "বামুন মানুষ, পুজোর জন্যে চেয়েছে, না বিক্রি ক'রে কি করা যায় বাবা?"

ক্ষণকাল নির্বাক থেকে সতর্জনে বিনোদ বললে, "ওরে মুখপুড়ী! তুইও তা হ'লে ওদের দলে? দাঁড়া, একটা লাঠি এনে হাঁড়ি ভেঙে তোর ভাত রাঁধার নিকুচি করছি!"

"কর্ না নিকুচি। আর আমি তা ব'লে এই রেতে হাঁড়ি কিনে এনে ভাত রাঁধছি নে। তোর বেচুলালই না খেতে পেয়ে সারা রাত ব্যা-ব্যা ক'রে চেঁচিয়ে মরবে।"

হাঁড়ি-ভাঙার পরিণাম যদি সেইরূপই হয়, তা হ'লে কার দণ্ড কে ভোগ করবে, সে এক সমস্যা! ঈষৎ দমিত কণ্ঠে বিনোদ বললে, "রাঁধ্ না তুই ভাত, কে তোর ভাত খায় দেখে নেব!"

উদ্গতপ্রায় হাসি কোন প্রকারে রোধ করে শুকতারা বললে, "আগে তুই পেট ভ'রে ভাত খাবি, তারপর তোর বেচুলালের কথা। তুই খাবার আগে ওকে একটি দানা খেতে দিচ্ছি নে।"

বিনোদ বুঝতে পারলে তার হাঁড়ি-ভাঙা অস্ত্র ভোঁতা হয়েছে,—আর তার দ্বারা বিশেষ কিছু উপকার পাবার আশা নেই। গভীর স্বরে "আচ্ছা দেখা যাবে" ব'লে স্থান ত্যাগ ক'রে সে সরাসরি উপস্থিত হ'ল বেচুলালের খোঁয়াড়ে। বাঁ হাত দিয়ে বেচুকে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু স্বরে বললে, "বেচু, শুনেছিস?"

সান্ধ্য-ভ্রমণের ফলে বেচুর বোধ হয় তখন কিছু ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। অকস্মাৎ জিভ বার ক'রে বিনোদের নাকটা একবার চেটে দিয়ে বললে, "উহুঁহুঁহুঁ!"

"এরা তোকে ভালবাসে না, বলি দিতে চায়। আজ রাত্তির হয়ে গেছে, আজ আর কাজ নেই, কাল সকালে তোতে আমাতে এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাব। কি বলিস?"

সামনের দু পা তুলে বিনোদের দেহের উপর খানিকটা ওঠবার চেষ্টা ক'রে বেচুলাল বললে, "হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ !"

৫

পরদিন প্রত্যুষে বহির্বাটির অঙ্গনে পায়চারি করতে করতে উমানাথ দাঁতন করছেন, এমন সময়ে বিপিন উপস্থিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রে বললে, "একটু পিছিয়ে দাঁড়ান দেবতা।"

দু-তিন পা উমানাথ পিছিয়ে গেলে যেখানে উমানাথ পূর্বে দাঁড়িয়েছিলেন তথাকার ধূলি নিয়ে মস্তকে বক্ষে ও মুখে দিয়ে বিনোদ পাঁচটি টাকা উমানাথের সম্মুখে স্থাপন করলে; তারপর উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললে, "হ'ল না ঠাকুর মশাই।"

চকিত কণ্ঠে উমানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল না ?"

"বিন্‌দে রাজী হ'ল না ছাগল বেচতে। কাল গভীর রাত পর্যন্ত কি যে অনৎথো করেছে তা আর কি বলব! আমি আর তার মা দুজনে মিলে কত বোঝানু,—বলে, বেচুলালকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাব। পাঁচটা টাকা দিতে গেনু, ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে পেয়ারা-তলায় এমন ছুঁড়ে ফেলে দিলে যে, রেতের বেলা কুল্লে দুটো টাকা খুঁজে পাই। বাকি তিনটে আজ সকালে খুঁজে পেতে নিয়ে এসেছি।"

বিপিনের কথা শুনতে শুনতে একটা পরাজয়ের গ্লানিতে উমানাথের মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। কাল থেকে মনের গভীরতম প্রদেশে বিনোদের সঙ্গে তাঁর ফল্গুধারার ন্যায় গোপন এবং সূক্ষ্ম যে রহস্যময় সংঘর্ষ চলেছিল এ পরাজয় সেই সংঘর্ষেরই অন্তর্গত। মনে পড়ল, ছাগলটাকে তাঁর দিকে ঈষৎ দুলিয়ে দিয়ে 'মাইরি চাঁদ' ব'লে ইতর ভাবে সম্বোধন।

মনে পড়ল, পড়তে পড়তে কোন রকমে তিনি সামলে গেলে পশ্চাৎ হতে উল্লাসের বিকট হাস্যলীলা। একটা দুর্মদ আক্রোশের তাড়নায় উমানাথের আকৃতি কঠিন হয়ে উঠল।

সেই নিঃশব্দ রুষ্ট মূর্তি দেখে ভীত হয়ে বিপিন বললে, "আমার অপরাধ নেই ঠাকুর মশাই, ছেলে ভারি অবুঝ।"

এবার কঠিন আবরণ বিদীর্ণ ক'রে নির্গত হ'ল ক্রুদ্ধ উত্তপ্ত বাষ্প।

"অবুঝ তোর ছেলে নয়, তুই নিজেই অবুঝ। একটা ব্যাদড়া ছেলের অন্যায় আবদারের জন্যে দেবতাকে যে অবহেলা করে অবুঝ সেই-ই। ও টাকা আমি নেব না। টাকা তোর, আমার ছাগল। তুই যদি নিতান্তই না দিস, দেবতাকে বলব—মা, আমাকে ক্ষমা ক'র, আমি নিরুপায়।" তার পর হাতের দাঁতনটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "দিন-কাল ক্রমশ এমন হ'ল যে, দাম দিয়েও একটা ছাগল পাওয়া যায় না। পূজো-পাঠ আর করব না বিপিন, এবার এখানকার পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় গিয়ে জুতোর দোকান খুলব।"

মুহূর্তের জন্য দু কানে আঙুল দিয়ে টাকাগুলো তুলে নিয়ে বিপিন বললে, "হ্যাঁ ঠাকুর মশাই, সত্যি কথা, টাকা আমার, ছাগল আপনার। ছাগল আপনি পাবেন। তবে দয়া ক'রে এই ক'টা দিন আমাদের বাড়িতেই থাকতে দিন; আপনি নিশ্চিন্তি থাকুন, পূজোর রেতে বিনোদ ঘুমালে আমি আপনাকে ছাগল দিয়ে আসব। কোনো অসুবিধে হবে না, সন্ধ্যে হতেই বিনুদে ভাত খায়, আর সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রে যায়।"

বিপিনের মতি-পরিবর্তনে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়ে উমানাথ এক মুহূর্ত কি চিন্তা করলেন, তার পর বললেন, "এক কাজ করলে হয় বিপিন।"

করজোড়ে বিপিন বললে, "আদেশ করুন।"

"আজ তো হাটবার, হরিপুরে গিয়ে তুই একটা ছাগল-ছানা কিনে

আন। যদি সেটা তোর বেচুলালের মতো নিখুঁত কালো হয়, তা হ'লে তাইতেই আমি কাজ চালাব, বেচুলাল বিনোদেরই থাকবে। আর, তেমন যদি না পাস্, তা হ'লে কয়েক দিনে নতুন ছাগলটা বিনোদের একটু নেওটো হয়ে গেলে বেচুলালের অভাবেও সে এমন কিছু গোল করবে না।"

উমানাথের কথা শুনে বিপিনের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বললে, "সাধে কি বলে, পণ্ডিত আর মুখ্খু আকাশ আর পাতাল? খাসা পরামর্শ"

পরামর্শ কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে ফলপ্রসূ হ'ল না। সেদিন হরিপুরের হাটে মাত্র তিনটে ছাগল-ছানা বিক্রয়ের জন্য এসেছিল, তন্মধ্যে নিখুঁত কালো কোনটাই ছিল না। একটা ছিল নিখুঁত সাদা, অর্থাৎ বেচুলালের ঠিক বিপরীত। অগত্যা বারো আনা মূল্য দিয়ে সেইটে কিনে বিপিন যখন বাড়ি ফিরল তখন দিবা দ্বিপ্রহর।

"বিন্‌দে, কে এসেছে, দেখবি আয়।" উচ্চৈঃস্বরে বিপিন ডাক দিলে।

অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হ'ল বিনোদ এবং সঙ্গে সঙ্গে বেচুলাল।

বিস্মিত নেত্রে হাসি-হাসি মুখে ক্ষণকাল নবাগতের প্রতি চেয়ে থেকে বিনোদ বললে, "এটা আবার কে রে?"

বিপিন বললে, "বেচুলালের ভাই।"

"নাম কি?"

"হীরেলাল।"

ঈষৎ উল্লাস সহকারে বিনোদ বললে, "হ্যাঁ! হীরেলাল, না কচুলাল!" তার পর সহসা বেচুলাল এবং কচুলালের মধ্যে ধ্বনিগত মিল লক্ষ্য ক'রে খুশী হয়ে ব'লে উঠল, "ঠিক হয়েছে, বেচুলালের ভাই কচুলাল,—বেচু আর কচু।"

কিন্তু বর্ণের অকলঙ্ক শুভ্রতার জোরে বেচুলালের ভাইয়ের নাম কিছুক্ষণ আলোচনার পর হীরালালই বজায় রইল।

স্নানের জন্য বিপিন মিত্তিরদের পুকুর-ঘাটে প্রস্থান করেছিল। বেচুলালের গলায় বাঁ হাতখানা জড়িয়ে দিয়ে বিনোদ বললে, "বেচু, হীরেলাল কে জানিস ?"

বিনোদের গালের কাছে মুখটা এনে নিম্ন স্বরে বেচু বললে, "উহুঁহুঁ !"

"হীরেলাল আমাদের সৎভাই। বাপ আমাদের এক, মা আলাদা।"

মুখখানা উঁচু ক'রে বেচুলাল বললে, "হুঁহুঁহুঁ !"

অদূরে শুকতারা মুখে কাপড় দিয়ে হাসলে ; তারপর কতকটা নিজ মনেই মৃদুস্বরে বললে, "বাঁচনু। একটা ছাগল-ছেলে নিয়ে অস্থির, আর একটা হ'লে গেছনু আর কি !"

দু হাতে কান দুটো ধ'রে হীরালালকে নিজের কাছে টেনে বিনোদ বললে, "শোন্ হীরেলাল, দু ভাইয়ে মিলে-মিশে থাকবি,—খবরদার ঝগড়া করবি নে। বুঝলি ?" তারপর হাত দিয়ে তার পিঠটা একটু চাপড়ে দেখে বললে, "উঃ ! কি ধূলো রে তোর গায়ে ! হরিপুর থেকে এতটা পথ এসেছিস কিনা তাই। দাঁড়া, বেচুর বুরুশটা এনে তোর গা ঝেড়ে দিই।" ব'লে প্রস্থান করলে।

বুরুশ নিয়ে ফিরে এসে বিনোদ হেসে গড়িয়ে পড়ল।

"মা, মা ! শীগগির আয়। দু ভাইয়ের কাণ্ড দেখে যা !"

তখন বেচুলাল আর হীরালাল সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে পরস্পরে কপাল-ঠোকাঠুকি লাগিয়েছে। সামনের দু পা গুটিয়ে পিছনের দু পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে দুজনে দুজনের কপালের উপর ভেঙে পড়ছে,

তারপর সোজা হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে পুনরায় সামনের দু পা গুটিয়ে উঁচু হয়ে উঠছে।

দূর থেকে দেখে শুকতারা বললে, "সে কি রে! এরই মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি লেগে গেল! হাজার হোক, সৎভাই কিনা!"

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বিনোদ বললে, "মারামারি নয়, মারামারি নয়, ভাব। দুজনে খেলা করছে।"

মৃদু হেসে শুকতারা বললে, "তবু ভাল। ওদের দুজনের তো ভাব হ'ল। এখন হীরেলালের সঙ্গে তোর ভাব হ'লে বুঝি। তুইও তো হীরেলালের সৎভাই।"

কিন্তু এ কথার নিষ্পত্তির জন্য অধিকক্ষণ অপেক্ষা করবার প্রয়োজন হ'ল না, সেই দিন সন্ধ্যার মধ্যেই হীরালাল বুঝতে পারলে, বিনোদ তার সৎভাই হ'লে কি হয়, তাই ব'লে অসৎ ভাই নয়।

৬

অমাবস্যার জমাট ঘন অন্ধকারের রাত্রি।

মুক্ত আকাশতলে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর শয়ন ক'রে বিনোদ গভীর নিদ্রায় অভিভূত। অদূরে শুকতারাও নিদ্রা যাচ্ছে।

দ্রুতবেগে অথচ সন্তর্পণে প্রবেশ করল বারো-তেরো বৎসর বয়সের এক বালিকা। বিনোদের পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে ঝুঁকে প'ড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ডাক দিলে, "বিনুদা! বিনুদা!"

অতি-গভীর ঘুম ঈষৎ তরল হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু সুবিধা হ'ল না। ফোঁস ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু মাথাটা অপর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বিনোদ পুনরায় ঘুমুতে আরম্ভ করলে।

অগত্যা গায়ে অল্প-অল্প ঠেলা দিয়ে বালিকা ডাকলে, "বিনুদা! বিনুদাদা!"

এবার মাথা তুলে বিনোদ বললে, "কে?"

"আমি রাজি।"

"রাজি!"—ধড়মড়িয়ে খাটিয়ার উপর উঠে ব'সে বিনোদ প্রশ্ন করলে, "কি বলছিস?"

"ওরা তোমার বেচুলালকে বলি দিচ্ছে।"

মুহূর্তের মধ্যে চটকা গেল ভেঙে। "সত্যি?" ব'লে খাটিয়া থেকে লাফিয়ে প'ড়ে উর্ধ্বশ্বাসে খোঁয়াড়ের কাছে উপস্থিত হয়ে বিনোদ দেখলে, বেচুলাল নেই, একাকী হীরালাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। অকারণে অনভ্যস্ত কালে সঙ্গীহারা হয়ে একটা অনির্ণেয় অস্বস্তিতে বোধ করি তার ঘুম আসছে না।

দুদ্দাড় ক'রে বিনোদ বেরিয়ে গেল।

মিনিট আষ্টেকের পথ মিনিট তিনেকে অতিক্রম ক'রে সে যখন জমিদার-বাড়ি পৌঁছল, তখন সেখানে সজোরে বলিদানের প্রাথমিক বাজনা বাজছে। দূর থেকে ডিঙি মেরে বিনোদ দেখলে, পুরোহিতের পাশে দাঁড়িয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে বেচুলাল তার ইহজীবনের শেষ খাদ্যের সুস্বাদু উপকরণসমূহ, যথা—কলা, শসা, দুর্বা, ছোলা, আতপ চাল প্রভৃতি চিবুচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ঘাড় উঁচু ক'রে খাড়া-কানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

দু হাতের দু জোড়া আঙুল মুখের মধ্যে পুরে বিনোদ তীক্ষ্ণ স্বরে একটা শিস দিলে; তার পর উচ্চৈঃস্বরে ডাকলে, "আয় বেচু-উ-উ! আয়, আয়, আয়—"

নিমেষের মধ্যে একটা অচিন্তিত কাণ্ড ঘ'টে গেল। বিনোদের ডাকও

শোনা আর চক্ষের পলকে বেচুলাল তার নিশ্চিন্ত রক্ষকের অসতর্ক হাত থেকে গলার অদীর্ঘ দড়িটা এক টানে ছিনিয়ে নিয়ে পূজা-বেদীর সিঁড়ি ভেঙে খড়্‌বড়্‌-খড়্‌বড়্‌ শব্দে দে ছুট !

বেদীর উপরকার লোকজন এবং পূজামণ্ডপের জনতা হৈ-হৈ ক'রে উঠল, বাজনা গেল থেমে এবং পুরোহিত স্মৃতিরত্ন আসনের উপর দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করতে লাগলেন। পর-মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে এলে দেখা গেল, বিনোদের কোলে চ'ড়ে বেচুলাল নিতান্ত সহজভাবে ভুক্তাবশিষ্ট আতপ চাল, যা মুখের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল, চর্বণ করছে,— আর প্রস্থানোদ্যত হয়ে বিনোদলাল পিছন ফিরেছে।

নিকটেই একজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে ছিল। সে ছুটে গিয়ে বিনোদের গালে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বেচুলালকে কেড়ে নিলে।

চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ প্রশ্ন উঠতে লাগল, "কে ওটা ?" "কে ও শয়তানটা ?"

পূর্বোক্ত ভৃত্য বললে, "ও বিপিন কৈবত্তোর ছেলে।"

গোমস্তা বেণীমাধব চিৎকার ক'রে উঠল, "সে হারামজাদা গেল কোথায় ? বিপ্‌নে ?"

জনতার ভিতর হতে কে একজন উত্তর দিলে, "সে ওস্তাদ লোক, সময় বুঝে সট্‌কে প'ড়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে উমানাথ বেদী থেকে গোটা দুই সিঁড়ি নেমে এসে কাঁপছিলেন; স্খলিত কণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "তাকে পিঠ-মোড়া ক'রে নিয়ে আয়।"

দুর্মদ ক্রোধে বিনোদের সমগ্র দেহ আগুন হয়ে উঠছিল; আর দুঃসহ তেজে সেই আগুন নির্গত হচ্ছিল তার শুষ্ক হিংস্র দুই চক্ষু-গহ্বর দিয়ে। একটা কিছু নিদারুণ ধরণের করবার জন্য

তার দুই বাহুর সমস্ত স্নায়ু স্ফীত হয়ে উঠে লাফালাফি লাগিয়েছিল। উমানাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে সে বললে, "তুমি না ছিঁতিরত্নো, সেদিন একশো বছর পেরমাই হোক ব'লে বেচুকে আশীর্বাদ করেছিলে? আর, আজকে তাকে বলি দিচ্ছ? এস না একদিন আমাদের পথে, ঢিল-পেটা ক'রে সাবাড় করব তোমাকে।"

তার পর, কাউকে কিছু বলবার বা করবার মুহূর্ত মাত্র অবসর না দিয়ে অদূরবর্তী হাড়কাঠের উপর উচ্ছলিত হয়ে লাফিয়ে প'ড়ে দুই বাহু দিয়ে দুই পাশের কাঠ সজোরে আঁকড়ে ধ'রে দেহটাকে ভূমির সঙ্গে কঠিনভাবে সংযুক্ত ক'রে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল।

পুনরায় একটা হৈ-চৈ আরম্ভ হ'ল। হাঁ-হাঁ ক'রে চতুর্দিক থেকে লোকজন ছুটে এসে কেউ বিনোদের হাত ধ'রে টানে, কেউ পা ধ'রে; কিন্তু মরিয়া মানুষের অবুঝ শক্তিকে পরাজিত করে এমন কোনো শক্তি সেখানে কারও দেহে আছে ব'লে মনে হ'ল না। মনে হ'ল, হাড়কাঠ আর বিনোদ এমন দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে এক হয়ে গেছে যে, বরং হাড়কাঠ মাটি থেকে উৎপাটিত হয়ে বেরিয়ে আসবে, তথাপি বিনোদকে হাড়কাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

একজন বললে, "মার আজ নরমাংস খাবার ইচ্ছে হয়েছে, দাও ওর গলায় এক কোপ বসিয়ে।"

আর একজন বললে, "স্মৃতিরত্ন মশাইকে হারামজাদা ঢিল-পেটা করছিল,—এবার ওকে ঢিল-পেটা ক'রে সাবড়াও।"

বোধ হয় এই প্রস্তাবের অনুসরণেই বিনোদের দেহের উপর অজস্র ধারায় কিল, চড়, পদাঘাত, এমন কি দু-চারটে ঢিল-পাটকেলও পড়তে লাগল; কিন্তু যে-পরিমাণ চেতনা হাড়কাঠে ছিল তার চেয়ে অধিক বিনোদের দেহে ছিল তার লক্ষণ দেখা গেল না।

"ওরে, মারিস নে, মারিস নে! ছেড়ে দে—"

সকলে চেয়ে দেখলে, বেদীর উপর দাঁড়িয়ে ভুবনেশ্বরী হাত তুলে বিনোদকে প্রহার করতে নিষেধ করছেন। পার্শ্বে দাঁড়িয়ে উমানাথ;—আকৃতি বিশেষ উৎসাহদীপ্ত ব'লে মনে হয় না।

উমানাথের সঙ্গে দু-চারটে কথা ক'য়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে ভুবনেশ্বরী বিনোদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "বিনোদ, উঠে এস।"

কোনো কথা না ব'লে বিনোদ উপুড় হয়ে প'ড়ে থেকেই প্রবল বেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানালে। তার পিঠের চামড়ার টান দেখে মনে হ'ল, সে যেন নূতন ক'রে আরও দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে ধরেছে।

"ভয় নেই, তোমার ছাগল বলি দেওয়া হবে না। চেয়ে দেখ, আমি মা-জননী।"

একটু আড় হয়ে তাকিয়ে ভুবনেশ্বরীকে দেখে বিনোদ হাড়কাঠ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে সোজাসুজি দৃষ্টি-বিনিময় হওয়া মাত্র অতর্কিতে একরাশ তপ্ত অশ্রু ঝরঝর ক'রে তার দুই চক্ষু হতে ঝ'রে পড়ল। যে দুঃসহ নির্যাতন তার দেহের উপর এই মাত্র সাধিত হয়েছে, এ অশ্রু তার বেদনার নয়; যে দুর্মদ প্রতিবাদের তাড়নায় তার সমস্ত দেহ-মন কঠোর হয়ে উঠেছিল, সেই তাড়নার শ্লথন-জনিত এই অশ্রু।

কাপড়ের খুঁটে তাড়াতাড়ি চক্ষু মার্জিত ক'রে বিনোদ বললে, "নিয়ে যাই?"

বেচুলালের দড়ি ধ'রে পূর্বোক্ত ভৃত্য নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল, ভুবনেশ্বরীর ইঙ্গিতে সে বিনোদের হস্তে রজ্জু প্রদান করলে।

ফাঁস খুলে দড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিনোদ বেচুলালকে কোলে তুলে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

"বিনোদ!"

ফিরে দাঁড়িয়ে বিনোদ ভুবনেশ্বরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"ছাগল তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম, কিন্তু এ ছাগল দেবতাকে উচ্ছুগ্‌গু করা হয়ে গেছে, একে যত্নে রেখো।"

ঘাড় নেড়ে বিনোদ সম্মতি জানালে।

পূজা-মণ্ডপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিনোদ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

"বিন্‌দা!"

পাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বিনোদ বললে, "কে রে? রাজি?"

বিনোদের কাছ ঘেঁষে এসে রাজি বললে, "হ্যাঁ। আমার কোলে একটু দেবে?—বেচুলালকে?"

বেচুলালের মুখ ধ'রে একটু নাড়া দিয়ে বিনোদ বললে, "কি রে বেচু? রাজির কোলে যাবি? রাজি ভারি ভাল মেয়ে, তোকে আজ ও-ই বাঁচিয়েছে। যাবি?"

বেচু তখনও বলিদানের নৈবেদ্যের শেষ আতপ-কণাগুলি মনোযোগ সহকারে চর্বণ করছিল,—কোনও উত্তর দিলে না।

"যা বেচু, রাজির কোলে যা।"—ব'লে বেচুলালের মুখে একটা চুমু দিয়ে বিনোদ বেচুকে রাজবালার কোলে দিলে।

"আমি একটা চুমু খাব বিন্‌দা?"

"কাকে রে?"

"শোন কথা! কাকে আবার? বেচুকে।"

"তাই বল্!"

"তা-ই তো বলছি।" ব'লে রাজি, তা ছাড়া আর যে কিছুই বলছিল না, তা সুস্পষ্ট করবার জন্য সশব্দে বেচুলালকে চুম্বন করলে।

"রাজি।"

"কি ?"

"তুই আমার বেচুকে চুমু খেলি, তোকেই আমি বিয়ে করব। তোকে আজ আমার ভারি ভাল লাগছে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে রাজি বললে, "তোমার তো তুগ্‌গোর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তুগ্‌গোরা বড়মানুষ, কত জিনিসপত্তোর তোমাদের দেবে।"

"ছাই জিনিসপত্তোর!—তুগ্‌গো কি করেছিল জানিস ?"

"কি করেছিল ?"

"পাঁঠা-বলি দেখবার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি গিয়েই ওকে দেখতে পেয়েছিলাম।—আর তুই আমাকে বলবি ?"

"কি বলব ?"

"তুগ্‌গোকে বিয়ে করতে ?"

কিছু না ব'লে রাজি চুপ ক'রে রইল।

এক মুহূর্ত রাজির উত্তরের জন্যে অপেক্ষা ক'রে বিনোদ বললে, "তুগ্‌গোকে আমি বিয়ে করছি নে। কে ওকে বিয়ে করবে জানিস ?"

এ প্রসঙ্গে উৎসাহিত হয়ে রাজবালা বললে, "কে করবে ?"

রাজবালার কোল থেকে বেচুলালকে নিজের কোলে নিয়ে আর একবার চুমু খেয়ে বিনোদ বললে, "তুগ্‌গোকে বিয়ে করবে আমাদের বেচুলাল।" তার পর হাত দিয়ে বেচুলালের মুখখানা নেড়ে দিয়ে বললে, "কি রে বেচু, তুগ্‌গোকে বিয়ে করবি ?"

আতপ চাল বোধ হয় শেষ হয়েছিল, বেচু বললে, "হুঁহুঁহুঁহুঁ !"

যুগল কণ্ঠের মিলিত হাস্যে পল্লীগ্রামের নিশীথ আকাশ চকিত হয়ে উঠল।

আশ্বিন, ১৩৫৯

অভিনয়

১

১৯৪২ সনের কথা। তখন সমারোহের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। জাপানী বোমার ভয়ে সারা কলিকাতা শহর মনে মনে মাথায় হাত দিয়ে নিরতিশয় উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করছে। সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যার পর প্রবীরকুমার রায় নামে একটি যুবক তার বন্ধু সুরেশের সন্ধানে বেনেটোলা লেনের এক মেসে এসে হাজির হ'ল। তার দিন দুই আগে হাতীবাগানের বাজারের পাশে বোমা পড়েছে।

সুরেশ মেসেই ছিল, হঠাৎ প্রবীরকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললে, "এ কি প্রবীর! এ সময়ে তুমি কলকাতায়? বোমার ভয়ে আমরা কলকাতা ছেড়ে ময়মনসিং পালাতে পারলে বাঁচি, আর তুমি কিনা ময়মনসিং থেকে কলকাতায় এসে হাজির হ'লে!"

প্রবীরের মুখে একটা নিষ্প্রভ হাসি ফুটে উঠল; বললে, "ময়মনসিং-এর চেয়েও দূরে যাওয়ার পথে আমি কলকাতায় এসেছি সুরেশ। তবে ময়মনসিং গেলে তোমরা বাঁচবে, কিন্তু আমি যেখানে যাবার চেষ্টায় আছি সেখানে যেতে হ'লে বাঁচা চলে না।"

সবিস্ময়ে সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "যুদ্ধে যাচ্ছ না কি হে?"

হাসিমুখে প্রবীর বললে, "যুদ্ধেই বটে; তবে রণক্ষেত্রের যুদ্ধে নয়,—জীবন-যুদ্ধে।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুরেশ বললে, "হেঁয়ালীর ভাষা ত্যাগ ক'রে, কি হয়েছে বল দেখি?"

"টি. বি. হয়েছে।"

চমকে উঠল সুরেশ; বললে, "টি. বি. হয়েছে? কার টি. বি. হয়েছে হে?"

প্রবীর বললে, "অবশ্য আমার।"

"তোমার?"—সুরেশ হাসতে আরম্ভ করলে।

স্মিতমুখে প্রবীর জিজ্ঞাসা করলে, "হাসছ যে?"

সুরেশ বললে, "হাসছি টি. বি.র বাসাখানি দেখে। পরিপুষ্ট, নধর, মসৃণ! এমন বাসা বড়লোক ব্লাড্‌প্রেসারের হ'লে মানায়; গরিব টি. বি.র এ রকম বাসা হয় না।"

প্রবীর বললে, "তা হয় সুরেশ। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা অসম্ভব নয়। ভবনদীর পরপারে আমাকে পৌঁছে দেবার জন্যে যাঁরা আমার ফুসফুসের মধ্যে তৎপর হয়েছেন, এখন তাঁদের উদ্যোগপর্ব। এখন তাঁরা নিজেদের জন্যে ঘাঁটি বাঁধতে ব্যস্ত; সে কার্য শেষ হ'লে ধ্বংসের কার্যে প্রবৃত্ত হবেন। তখন দিন-দিন এই বপু তনুতে পরিণত হতে থাকবে; যে বাসার কথা বলছিলে, তার কাঠে ধরবে ঘুণ, চুন-বালিতে নোনা; তার এলামাটির চাঁপাফুলের রঙ দেখতে দেখতে ফ্যাকাসে মেরে আসবে।" ব'লে হাসতে লাগল।

প্রবীরের কথা শুনতে শুনতে সুরেশ ঈষৎ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। প্রবীর তার বাল্যবন্ধু, এক গ্রামবাসী। উভয়ে একসঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতায় এক বাসায় বাস ক'রে লেখাপড়া শেষ করে। এম. এ. পাস ক'রে সুরেশ মোটা মাহিনায় একটা সওদাগরী অফিসে চাকরি করছে। প্রবীর এম. এস্‌-সি. পাস ক'রে দেশসেবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনা নিয়ে গ্রামে ফিরে গেছে। চাকরি সে করবে না, জমিদারি চালাবারও বিশেষ ইচ্ছে তার নেই; সুবিধা

মতো দাম পেলে জমিদারি বিক্রয় ক'রে দেবে। তার মনের একমাত্র বাসনা গাছ-পালা, জড়ি-বুটি, ফল-মূল, অম্ল-ক্ষার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জননী ধরিত্রী যে অপরিমিত কল্যাণ দান করবার জন্য সতত উদ্যতহস্ত, পরিপূর্ণভাবে তা গ্রহণ করবার জন্য গ্রামের পাশে এক বিরাট ভেষজ-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করবে। এই কারখানায় যে-সকল রাসায়নিক সামগ্রী প্রস্তুত হবে, তা বাংলা দেশের চাহিদা মিটিয়ে সারা ভারতবর্ষে, এমন কি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। এ যদি সে করতে পারে, তবেই তার রসায়নশাস্ত্রে এম. এস-সি. পাস করা সার্থক; অন্যথা ভস্মে ঘি ঢালা হবে।

সুরেশ জানে, প্রবীর বাজে কথা বলবার মানুষ নয়; অকারণ ভয় পাবার মতো দুর্বলতাও তার নেই। তাই তার কথায় ঈষৎ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কে বললে তোমাকে, তোমার টি. বি. হয়েছে?"

স্মিত মুখে প্রবীর বললে, "দুজন। প্রথমত আমার অনুমান-শক্তি, দ্বিতীয়ত কানাই ডাক্তার।"

হেসে উঠে সুরেশ বললে, "তোমার অনুমান-শক্তি! তুমি একজন ডাক্তার নাকি প্রবীর?"

প্রবীর বললে, "মেডিক্যাল কলেজের ডিপ্লোমা পাওয়া ডাক্তার নই, কিন্তু বিধাতার হাত থেকে রোগ-নির্ণয়ের ক্ষমতা-পাওয়া ডাক্তার। সে কথার প্রমাণ কয়েকবারই দিয়েছি। কিন্তু আমার কথা না-হয় বাদই দিলাম, কানাই ডাক্তার তো এম. বি. পাস করা ডাক্তার! আমার পূর্ব ইতিহাস আর রোগের লক্ষণ শুনে বহুক্ষণ ধ'রে আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখে, তার আর বিশেষ কিছু সন্দেহ নেই। তবে সে বলে, একেবারে সূত্রপাত।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "পূর্ব ইতিহাস কি তোমার?"

প্রবীর বললে, "আমার বড় মাসিমার ছোট জামাই হরিপদর বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। আমার মাসতুত বোন প্রতিভা আমাকে যাবার জন্যে কান্নাকাটি ক'রে লিখেছিল। শুনেছিলাম হরিপদ অনেক দিন ধ'রে কালাজ্বরে ভুগছে। গিয়ে দেখি, কালাজ্বর নয়, যক্ষ্মা : প্রতিদিন ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে। কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করাতে কবিরাজ বললে, অনেক আগে কালাজ্বর ব'লে সন্দেহ হয়েছিল, গত ছ মাস যক্ষ্মার চিকিৎসা চলছে। আমার যাবার দিন সাতেক পরে হরিপদ মারা গেল। মারা যাবার আগের দিন সে আমার দু হাত চেপে ধ'রে বলেছিল—'প্রবীর, তোমার ওপর অনেক বোঝা চাপিয়ে গেলাম ভাই।' বাড়ি ফিরে আসবার চার-পাঁচ দিন পরেই বুঝতে পারলাম, হরিপদ আমার ওপর শুধু প্রতিভাদের ভারই চাপিয়ে যায় নি, তার ব্যাধির ভারও চাপিয়ে গেছে।"

"কি ক'রে বুঝলে ?"

"লক্ষণ দেখে। শরীর ম্যাজম্যাজ করে, কোনো জিনিসে উৎসাহ পাই নে, দুর্বলতা বোধ করি, ক্ষিধে ক'মে গেল, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা জ্বরভাব-জ্বরভাব মনে হয়।"

"এখনো হয় ?"

"হ্যাঁ, এখনো হয়।"

"কতটা ক'রে জ্বর ওঠে ?"

"থার্মোমিটারে জ্বর ওঠে না, অথচ মাথা টিপ-টিপ করে, চোখ জ্বালা করে, ঘন-ঘন হাই ওঠে। ওকেই তো বলে সর্বনেশে চোরা-জ্বর, যা ভেতরে ভেতরে শরীরকে খাক্ ক'রে দেয়।"

"গয়েরের সঙ্গে কখনো রক্ত-টক্ত দেখতে পেয়েছিলে ?"

"তা পাই নি, তবে গয়েরে আমি রক্তের গন্ধ পাই সুরেশ।"

গম্ভীর মুখে সুরেশ বললে, "ও রক্তর গন্ধ নয়।"

"তবে ?"

"ভয়ের গন্ধ।"

হো-হো ক'রে প্রবীর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। বললে, "ও ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়! তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, পরীক্ষা ক'রে দেখার পর কানাই ডাক্তার যখন পনেরো আনা সন্দেহ প্রকাশ করলে, তখন বাকি এক আনাকে সান্ত্বনার এক আনা মনে ক'রে মনটা একটু বিচলিত হয়ে উঠেছিল। যখন মনে হ'ল অবিলম্বে ছেড়ে যেতে হবে এই বাইশ বছরের যৌবনোচ্ছল স্বপ্নভরা জীবন, এই দুঃখময় বাংলা দেশ আর দুঃখের নাগপাশ থেকে তাকে মুক্ত করবার দুর্বার সংকল্প, এই আকাশ-বাতাস গন্ধ-গানভরা পৃথিবী—"

সুরেশ যোগ ক'রে বললে, "আর—"

স্মিতমুখে প্রবীর বললে, "হ্যাঁ, আর,—তখন অকস্মাৎ এমন একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম যা সত্যিই অদ্ভুত। চন্দ্র-সূর্য ছাড়া আর একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যে আমাদের অগোচরে পৃথিবীর কোনো এক জায়গায় জ্বলে, আগে তা জানতাম না। ফস ক'রে কে সেটা নিবিয়ে দিলে। শুধু চতুর্দিকই নয়, চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত ঝাপসা হয়ে গেল। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পর চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। মরতে যদি একান্তই হয় তো হাসিমুখে বীরের মতো মরাই ভাল। ভাবলাম, ময়মনসিং শহরে গিয়ে কোন ভাল ডাক্তারের পরামর্শ নিই। কানাই ডাক্তার বললে, কোন লাভ হবে না তাতে। সে ডাক্তারের পরামর্শের ওপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিত থাকা চলবে না, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যেতেই হবে। সুতরাং অনর্থক সময় নষ্ট না ক'রে অবিলম্বে কলকাতায় গিয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করাই বিধেয়।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এখানে ?"

কলিকাতার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের নাম ক'রে প্রবীর বললে, "এঁরা যা বিধান দেবেন বিধিমতে তা পালন করব। যদি কোন যক্ষ্মা-নিবাসে গিয়ে চিকিৎসা করাতে বলেন তা হ'লে অবিলম্বে সেখানে চ'লে যাব। অর্থাৎ একজন **honest soldier**-এর মত একটা **good fight** দেব; তাতেও যদি পরাজিত হই, হাসিমুখে যমরাজের সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করব।" ব'লে হাসতে লাগল।

"লক্ষ্মীবাবু!"

সুরেশের ঘরটি ডবল-শয্যার ঘর। কামরার অপর প্রান্তে তক্তাপোশের ওপর আপাদমস্তক গায়ের কাপড়ে আবৃত হয়ে প্রবীরের অগোচরে একটি লোক শুয়ে ছিল, সে-ই লক্ষ্মীনারায়ণ। গায়ের কাপড়ের ভিতর থেকে সে উত্তর দিলে, "বলুন।"

"জেগে আছেন ?"

"দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখে বলি।"

অল্প একটু হেসে উঠে সুরেশ বললে, "তা-ও বটে! প্রবীর নামে আমার এক বন্ধু এসেছে।"

"তা বুঝেছি।"

"আমাদের কথাবার্তা শুনেছেন ?"

"শুনেছি।"

"সব ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সব। জাপানী বোমা থেকে আরম্ভ ক'রে যক্ষ্মা-নিবাস পর্যন্ত।"

এবার সুরেশ ও প্রবীর উভয়েই হেসে উঠল। সুরেশ বললে, "এ বিষয়ে আপনি কি বলেন ?"

"আমি বলি, ওসব বড় বড় ডাক্তার আপাতত জীইয়ে রেখে প্রথমে বিনোদ চাটুজ্জেকে দেখানো উচিত।"

সুরেশ বললে, "আমিও তাই বলি। দয়া ক'রে আলোয়ানের ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে একবার বেরিয়ে আসুন তো। বোমা পড়বার ভয় আপাতত নেই। একটু পরামর্শ করা যাক।"

"তাই করা যাক।" ব'লে দু'হাত দিয়ে গায়ের কাপড়টা পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে সুরেশদের নিকটে এসে ব'সে লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, "নমস্কার প্রবীরবাবু!"

দু হাত যুক্ত ক'রে ব্যস্ত হয়ে প্রবীর বললে "নমস্কার!"

লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, "আপনি যখন আপনার কাহিনী বলছিলেন, তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন আমার কাহিনীই আপনার মুখ থেকে শুনছি। আপনার কাহিনী আর আমার কাহিনী অবিকল এক; তফাত শুধু আপনি দিন সাতেক যক্ষ্মা-রোগীর সেবা করেছিলেন, আর আমি করেছিলাম মাস সাতেকেরও বেশী। বিনোদ চাটুজ্জেকে দেখিয়ে শিশি চারেক ওষুধ খেয়ে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছি মশায়। আপনি যে-সব ডাক্তারের নাম করছিলেন, বিদ্যেতে বিনোদ চাটুজ্জে তাঁদের কারোর চেয়ে কম নন; তবে বয়সে কম ব'লে অভিজ্ঞতায় হয়তো কিছু কম। কিন্তু অভিজ্ঞতা বেশী হ'লেই যে ডাক্তার মারাত্মক হয় না, তার দুর্দান্ত প্রমাণ আমাদের গ্রামের রাজকুমার ডাক্তার।" ব'লে হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ তিনজনে মিলে একটা গভীর পরামর্শ চলল। লক্ষ্মীনারায়ণের মুখে তার নিজের কথা এবং আরও কয়েক জন রোগীর বিষয়ে বিনোদ ডাক্তারের বিস্ময়জনক রোগনির্ণয় এবং সুচিকিৎসার কাহিনী শুনে বিনোদ ডাক্তারকে দেখানোই প্রবীর স্থির ক'রে ফেললে। একই

ব্যাধিতে পীড়িত রোগী নিজমুখে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তার চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কিছু হতে পারে না।

সুরেশ বললে, "স্বচক্ষেই তো দেখলাম লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর দিন দিন তলিয়ে যাওয়া, আর দেখতে দেখতে কয়েক দিনে ভেসে ওঠা। সুতরাং ডক্টর বিনোদ চ্যাটার্জি—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কাল শনিবার সকাল সকাল ছুটি। কালই আপনি প্রবীরকে ডক্টর চ্যাটার্জির চেম্বারে নিয়ে যান লক্ষ্মীবাবু।"

গাত্রোত্থান ক'রে লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, "যথা আজ্ঞা,—তাই হবে। দুই বন্ধুতে আপাতত আড্ডা জমান।"

সহাস্যমুখে প্রবীর বললে, "এখন কিন্তু আমরা তিন বন্ধু।"

লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, "নিঃসন্দেহ। তৃতীয় বন্ধু কিন্তু উপস্থিত চলল আলোয়ানের ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রয় নিতে। জাপানী বোমার ভয় না থাকতে পারে, কিন্তু আবহাওয়া-রাজ যে দুর্দান্ত শৈত্যের বাষ্প ছাড়তে আরম্ভ করেছেন, তাও কম মারাত্মক নয়।"

লক্ষ্মীনারায়ণের কথা শুনে প্রবীর ও সুরেশ হাসতে লাগল।

২

পরদিন অপরাহ্লে প্রবীরকে নিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ ডক্টর চ্যাটার্জির চেম্বারে উপস্থিত হ'ল। বেয়ারাকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে উভয়ে অপেক্ষা-কক্ষে গিয়ে উপবেশন করল।

প্রশস্ত ঘর। রোগী এবং রোগীর সঙ্গীদের বসবার জন্য অনেকগুলি সোফা এবং চেয়ার আছে। মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ গোলাকার টেবিল। অপেক্ষকদের অবসর-বিনোদনের জন্য তার উপর মাসিক, পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক সচিত্র পত্রসমূহ স্তূপাকারে সজ্জিত।

অপেক্ষকদের মধ্যে নানা লোকের নানা প্রকারের অবস্থা। আত্মীয়ের আরোগ্য সম্বন্ধে যে প্রায় হতাশ হয়েছে, বিমর্ষমুখে নতমস্তকে সে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে; যে সৌভাগ্যবান নিশ্চিত আরোগ্যের অভয়বাণী পেয়েছে, সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য সে ব্যস্ত, যুদ্ধে জাপানের জয়-পরাজয় সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট অভিমত শোনাবার ব্যগ্রতা তার আছে; সংশয়ের অনিশ্চয়তার দোলায় যে দোলায়িত, দ্রুতগতিতে সে ছবির পাতা উল্টে যাচ্ছে, চোখে আর ছবিতে কতটা বোঝাপড়া হচ্ছে, তা বোধ করি সে নিজেও ঠিক বলতে পারে না; আর প্রবন্ধের মর্মকথার মধ্যে যে নিবিষ্ট হয়েছে সে সম্ভবত এসেছে আরোগ্যের পর fitness-এর সার্টিফিকেট নিতে।

আধ ঘণ্টাটাক পরে লক্ষ্মীনারায়ণ ও প্রবীরের ডাক পড়ল। লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখে বিনোদ চাটুজ্জে চিনতে পারলেন; বললেন, "কি খবর আপনার? কেমন আছেন?"

লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, "আমি ভাল আছি।" প্রবীরকে দেখিয়ে বললে, "অসুখ আমার বন্ধুর।"

"কি অসুখ?"

"অনেকটা আমারই মতো।"

সহাস্য মুখে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "তা হ'লে তো কোনো অসুখই নয়।"

প্রবীর বললে, "দেশে যে ডাক্তার আমাকে দেখছিলেন, এখানকার ডাক্তারকে দেখাবার জন্যে তিনি একটা রিপোর্ট দিয়েছেন।" ব'লে পকেট থেকে একটা খাম বার ক'রে ডক্টর চ্যাটার্জির হাতে দিলে।

নিবিষ্টচিত্তে রিপোর্ট পাঠ ক'রে ডক্টর চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার ভগ্নীপতির সঙ্গে খাবার-দাবারের ছোঁয়াছুঁয়ি কিছু হ'ত না তো?"

প্রবীর বললে, "জানত তো হ'ত না; অজ্ঞাতসারে যদি হয়ে থাকে, বলতে পারি নে।"

"তেষ্টা পেলে রোগীর ঘরের গেলাসে জল-টল খেতেন?"

"না, তা খেতাম না।"

"কাছাকাছি মুখোমুখি হয়ে কথাবার্তা বলতেন?"

ঈষৎ চিন্তা ক'রে প্রবীর বললে, "সাধারণত বলতাম না, তবে খুব যখন কষ্টের অবস্থায় কাছে ডেকে কিছু বলত, তখন বলতে হ'ত।"

"রাত্রে রোগীর ঘরে শুতেন?"

"পাশের ঘরে শুতাম; কিন্তু অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন হ'ত, তখন দু-চার ঘণ্টাও রোগীর ঘরে কাটাতে হ'ত।"

আরও দু-চারটে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ক'রে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "আসুন, এবার আপনাকে পরীক্ষা ক'রে দেখি।"

ঘরের এক কোণে একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে রোগী-পরীক্ষার শয্যা। তথায় প্রবীরকে নিয়ে গিয়ে শয্যার উপর শুইয়ে ডক্টর চ্যাটার্জি পরীক্ষা-কার্যে প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমে তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টির দ্বারা ক্ষণকাল রোগীর আকৃতি পর্যবেক্ষণ করলেন; তারপর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আপাদমস্তক সকল স্থান সযত্নে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন; সর্বশেষে স্টেথোস্কোপের সাহায্যে রোগীর ফুস্‌ফুসের নিভৃততম প্রদেশে উপনীত হয়ে সুদূরপ্রসারী অনুসন্ধান-কার্যে সমাহিত হলেন। গভীর অভিনিবেশ-সহকারে কান পেতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কথোপকথন শুনতে লাগলেন; বুক পিঠ পাঁজরা সকল প্রদেশের সংবাদ আহরণ শেষ হ'লে প্রবীরকে নিয়ে পূর্বস্থানে ফিরে এসে বললেন, "নাঃ, ও-সব কিছু নয়। ওষুধ লিখে দিচ্ছি, দু-চার শিশি খেলেই ভাল হয়ে যাবেন।"

চিঠির কাগজের দুই পৃষ্ঠা ভ'রে প্রেসক্রিপশন ও উপদেশাদি লিখে প্রবীরের হাতে দিয়ে সহাস্যমুখে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "ভয় নেই, ঠিক আছেন।"

উৎফুল্লমুখে প্রবীর জিজ্ঞাসা করলে, "এক্স-রে করতে হবে কি ডক্টর চ্যাটার্জি ?"

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "নিশ্চয় হবে। ঐতে সব লিখে দিয়েছি। আপনার ক্ষেত্রে তো একজন ডাক্তার সন্দেহ করেছেন, এ রোগের কেউ স্বপ্ন দেখলেও আমরা এক্স-রে করাই।"

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ ক'রে ডাক্তারকে দক্ষিণা দিয়ে প্রবীর ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রস্থান করলে।

৩

দিন ছয়েক পরে প্রবীর একাই ডক্টর চ্যাটার্জির চেম্বারে এসে উপস্থিত হ'ল।

প্রবীরকে দেখে ডক্টর চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন ?"

প্রফুল্লমুখে প্রবীর বললে, "ভাল আছি।"

"এক্স-রে তো করিয়েছেন দেখছি।"

হাতের বৃহৎ খাম থেকে এক্স-রে প্লেট বার করতে করতে প্রবীর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, করিয়েছি। তাঁরা বললেন, কোথাও কিছু চিহ্ন নেই। দেখবেন তো আপনি ?"

স্মিতমুখে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "খরচপত্র ক'রে করালেন, একবার দেখতে হবে বই কি।" তারপর এক্স-রে প্লেটখানা কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে দেখে প্রবীরের হাতে প্রত্যর্পণ ক'রে বললেন, "তবে আর কি!

এখন নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরে যান। দেহে একটু শক্তি সামর্থ্য পেয়েছেন তো?"

"তা পেয়েছি।"

সহাস্যমুখে বিনোদ ডাক্তার বললেন, "এক্স-রে প্লেট পাবার পর থেকে?"

ব্যগ্র কণ্ঠে প্রবীর বললে, "আজ্ঞে না, তার আগে থেকেই, আপনার অভিমত পাবার পর থেকে। ডক্টর চ্যাটার্জি!"

"বলুন।"

"দেশ থেকে আপনাকে এক-আধখানা চিঠি লেখবার দরকার হতে পারে হয়তো।"

"কিসের জন্যে?"

"যদি কোন উপদেশ অথবা পরামর্শ নেবার দরকার ঘটে।"

"তা লিখবেন।"

"আপনার সময় অতিশয় মূল্যবান, চিঠির উত্তর দিতে সে সময়ের খানিকটা অপব্যয় নিশ্চয়ই হবে, সে জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ যৎসামান্য আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি।" ব'লে কুণ্ঠিতভাবে প্রবীর একখানা এক শ' টাকার নোট টেবিলের উপর দিয়ে ডক্টর চ্যাটার্জির সম্মুখে চালিয়ে দিলে।

যে পথে নোটখানা এসেছিল ঠিক সেই পথে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "ফিজ নিই, বকশিস নিই নে।"

ব্যগ্র অপ্রস্তুত কণ্ঠে প্রবীর বললে, "না না, ডক্টর চ্যাটার্জি, আমি তেমন কিছু নিশ্চয়ই mean করি নি; তেমন কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না।"

তেমনি হাসতে হাসতে ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "ঠিক আছে, দরকার পড়লে চিঠি লিখবেন। আপনার বিয়ে হয়েছে প্রবীরবাবু ?"

স্মিতমুখে প্রবীর বললে, "আজ্ঞে না, হয় নি।"

"দেশে ফিরে গিয়ে ঘটক লাগান,—বিয়ে করুন।"

"বিয়ে আমি করতে পারি ?"

"নিশ্চয় পারেন। না পারবার মতো কোনো অপরাধ তো আপনি করেন নি।"

সহসা প্রবীরের চক্ষের সম্মুখে ধরিত্রী পুনরায় নূতন আলোক, নূতন গীতি, নূতন গন্ধ, নূতন অনুভূতি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চন্দ্র-সূর্যের অতিরিক্ত যে তৃতীয় জ্যোতিষ্ক ভীষণ ব্যাধির আশঙ্কায় একদিন নিবে গিয়েছিল, দ্বিগুণ প্রভায় তা আবার জ্ব'লে উঠল। তবে আর কি! অমিয়া, তবে আর কি! তোমার আমার মিলনের পথে আর কোন বাধা রইল না। তোমার দুর্বার প্রেম নিষ্ফল হবার নয়। সেই প্রেমেরই কল্যাণে দুঃসহ সংশয়ের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছি।

"বাড়ি ফিরবেন কবে ?"

ডক্টর চ্যাটার্জির কণ্ঠস্বরে প্রবীর ক্ষণকালের চিন্তাস্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে উঠল ; বললে, "গিরিডিতে আমার এক মামা থাকেন, আমাকে যাবার জন্যে বিশেষ ক'রে লিখেছেন। এত কাছাকাছি যখন এসে পড়েছি, ভাবছি দিন দশ-পনেরো সেখানে কাটিয়ে যাই। অন্য পরিবারের মধ্যে বাস করায় আমার পক্ষে আর কোনও আপত্তি নেই তো ডক্টর চ্যাটার্জি ?"

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, "কিছু মাত্র না।"

ডক্টর চ্যাটার্জিকে ফিজ এবং সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিয়ে প্রসন্ন অন্তঃকরণে প্রবীর প্রস্থান করলে।

৪

দশ-পনেরো দিনে গিরিডি থেকে ফেরা হয়ে উঠল না। মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন প্রবীর নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করলে।

গৃহে পৌঁছে সে অবগত হ'ল, কাশীধামে কানাই ডাক্তারের মায়ের মৃত্যু হওয়ায় কানাই কাশী গেছে, তথায় শ্রাদ্ধাদি সমাপন ক'রে তারপর দেশে ফিরবে।

সন্ধ্যার পর প্রবীর উৎফুল্ল হৃদয়ে অমিয়াদের গৃহাভিমুখে রওয়ানা হ'ল। কানাই ডাক্তার ছাড়া একমাত্র অমিয়াই তার অসুখের কথা জানে। কলিকাতা রওয়ানা হবার আগের দিন প্রবীর এই দুঃসংবাদ তাকে জানায়। শুনে অচিন্তিত বিপদের উৎকট আতঙ্ক ও নৈরাশ্যে অমিয়া একেবারে ভেঙে পড়েছিল। আজকের শুভ সংবাদে অমিয়ার সেই দুশ্চিন্তা-মলিন মুখ আবার কিরূপ উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে প্রবীর পথ চলছিল।

একই গ্রামে বাস ব'লে বাল্যকাল হতেই অমিয়ার সহিত তার পরিচয়। উভয়ের কলিকাতায় অধ্যয়নকালে এই পরিচয় ক্রমশ অন্তরঙ্গতায়, এবং অন্তরঙ্গতা থেকে শেষ পর্যন্ত সুগভীর প্রেমে পরিণতি লাভ করে। প্রবীর যে-সময়ে এম. এস-সি. পড়ে, সেই সময়ে অমিয়া গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলিকাতায় তার মাতুলালয়ে আই. এ. অধ্যয়ন করতে আসে। রূপে, গুণে, অর্থে, বিদ্যায়, চরিত্রে প্রবীরের মতো দুর্লভ পাত্রের সহিত অমিয়ার বিবাহ শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, পরন্তু সুনিশ্চিত ব্যাপার জানা থাকায়, অমিয়ার মামার বাড়িতে উভয়ের মেলামেশার সুযোগ হতে পেয়েছিল অবাধ।

কিন্তু গোল বেধেছিল একটু, এই মাতুলালয়েই কমলা নামে একটি

পরমা সুন্দরী এবং সপ্রতিভ মেয়েকে নিয়ে। অমিয়ার এক মামাতো বোনের সে ছিল সহপাঠিনী। সর্বদাই সে এই গৃহে বেড়াতে আসত, এবং দৈবযোগে এক-আধ দিন প্রবীরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও হয়ে যেত। এই দৈবযোগের আবর্তন ক্রমশ এরূপ অবিলম্বিত হতে লাগল যে, এর মধ্যে মানুষের ইচ্ছাযোগের অস্তিত্বও সন্দেহ করলে বিশেষ-কিছু অন্যায় হয় না। দেখা-সাক্ষাতের আনুকূল্যে পরিচয়ও হয়ে চলল ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর। পরিচয় স্থাপন করবার বিষয়ে কমলা মেয়েটির শুধু যে একটা সহজ দক্ষতা ছিল তাই নয়, বর্তমান ক্ষেত্রে সে একটা বিশেষ সুযোগও খুঁজে পেয়েছিল। সে ছিল আই. এস-সি. ক্লাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, সুতরাং একজন প্রথম শ্রেণীর আর্টসের ছাত্রীকে পিছনে ফেলে রেখে এম. এস-সি. ক্লাসের বিজ্ঞানের ছাত্রের সঙ্গে সে অবলীলাক্রমে আলাপ জমাত। তার আচরণের দ্বারা প্রকাশ পেত, বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসাবে প্রবীরের উপর তার একটা অগ্রাধিকার থাকা স্বাভাবিক।

কমলার এইরূপ প্রবল আবির্ভাবের দাপটে অমিয়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। তার অন্তঃকরণ অনুদার ছিল না, কিন্তু প্রণয়ের ক্ষেত্রে ঔদার্যেরও কোনো অর্থ হয় না। দিনে দিনে কমলার প্রতি তার মন বিরূপ হয়ে উঠছিল। কিন্তু মনের এই অনতি-উগ্র বৈরূপ্য সহসা সে-দিন তিক্ত বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল, যেদিন সে প্রথম জানতে পারে প্রবীরের সঙ্গে কমলার বিবাহ-প্রস্তাবের কথা। সেদিন শান্ত ভাল মানুষ অমিয়া তার মনের স্থৈর্য ধ'রে রাখতে পারে নি। আশ্বাস দিয়ে প্রবীর তাকে বলেছিল, ভয় পাও কেন অমিয়া? সত্যি সত্যিই তুমি যে আমার স্ত্রী, শুধু মন্ত্রপাঠ করি নি ব'লেই সে বিশ্বাস হারাও কেন? এ আশ্বাসে অমিয়ার মনের সন্ত্রাস হয়তো খানিকটা অপসৃত হয়েছিল, কিন্তু বিদ্বেষ এত সহজে যায় না।

অমিয়াদের গৃহে পৌঁছে প্রবীরের প্রথম দেখা হ'ল অমিয়ার মা সুরবালার সহিত। প্রবীরকে দেখে সাদরে তাকে আহ্বান ক'রে সুরবালা বললেন, "কবে এলে বাবা, মামার বাড়ি থেকে?"

সে কথার উত্তর দিয়ে প্রবীর বললে, "মেসোমশাই কোথায় মাসিমা?"

সুরবালা বললেন, "তিনি নন্দীপুরে গিয়েছেন।"

"আজই ফিরবেন তো?"

"হ্যাঁ, আজই ফিরবেন। তবে বেশী রাত হতে পারে।"

"অমিয়া কোথায়?"

সুরবালা বললেন, "তুমি মাঝের ঘরে গিয়ে ব'সো, আমি অমিয়াকে ডেকে দিচ্ছি।"

মাঝের ঘরে প্রবেশ ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে প্রবীর একখানা ছবির বই নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে, এমন সময়ে অমিয়া প্রবেশ করলে। প্রবীরের কাছে এসে নত হয়ে করজোড়ে প্রণাম ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে জিজ্ঞাসা করলে, "কবে এলে প্রবীরদা?"

সহাস্যমুখে প্রবীর বললে, "কাল সন্ধ্যায়। দুঃসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলাম অমিয়া, সুসংবাদ এনেছি তোমার জন্যে।"

অমিয়ার মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। "সুসংবাদ এনেছ? তা হ'লে ও-সব কিছু নয় তো?"

"একেবারে কিছু নয়। মস্ত বড় ডাক্তার বিনোদ চাটুজ্জে,—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ক'রে তিনি বলেছেন, ফুসফুস একেবারে নির্দোষ; এক্স-রে করিয়েও তাই প্রতিপন্ন হয়েছে। তোমারই পুণ্যে অত বড় সাংঘাতিক রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি অমিয়া।"

প্রফুল্ল মুখে অমিয়া বললে, "বাঁচা গেল।" তারপর দু হাত যুক্ত ক'রে

ঈষৎ নতমস্তকে প্রবীরের অলক্ষিতে কি একটা করলে। হয়তো প্রণামই করলে কোন ঠাকুরদেবতার উদ্দেশে।

স্মিতমুখে প্রবীর বললে, "বিনোদ ডাক্তার কি বলছিলেন জান অমিয়া? বলছিলেন, দেশে ফিরে গিয়ে ঘটক লাগিয়ে বিয়ে করুন। মনে মনে উত্তর দিয়েছিলাম, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ ঘটক হয়ে যার বিয়ে দিয়েছেন, সে আবার ঘটক লাগাবে কেন?" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

"অমিয়া!"

জিজ্ঞাসু নেত্রে অমিয়া প্রবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"এবার তা হ'লে চল।"

"কোথায়?"

"আমাদের বাড়ি।"

মৃদু হাস্যের একটা ক্ষীণ আভা অমিয়ার অধরপ্রান্তে দেখা দিলে; বললে, "বিয়ের কথা বলছ প্রবীরদা?"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রবীর বললে, "অতি অবশ্য বলছি। আজই মাসিমার সঙ্গে কথা ক'য়ে বিয়ের দিন স্থির ক'রে যাব। সামনের ফাগুন মাসেই কোন শুভদিনে বাড়িতে লক্ষ্মীপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

এক মুহূর্ত নীরবে কি চিন্তা ক'রে অমিয়া বললে, "আমি বলি প্রবীরদা, বিয়ে এখন কিছু দিন থাক্।"

বিস্মিত কণ্ঠে প্রবীর বললে, "কেন?"

নিমেষের জন্য প্রবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অমিয়া বললে, "রোগটা তো বিশ্রী প্রবীরদা,—এ রোগে বিয়ে—"

অমিয়ার বাক্যের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে অধীরোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রবীর বললে, "রোগ তো বিশ্রী নিশ্চয়ই; কিন্তু রোগ কোথায় অমিয়া!

রোগ তো আমার ফুসফুসে ছিল না—ছিল আমার মস্তিষ্কে। ডাক্তার নিশ্চিত হয়েছেন, আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, তুমি হতে পারছ না কেন?"

অমিয়া বললে, "কানাই ডাক্তার বলেন, এ রোগে যত সাবধানই কেউ হোক না কেন, অতি-সাবধানী তাকে বলা চলে না।"

এবার প্রবীর প্রচণ্ড ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, "চুলোয় যাক তোমার কানাই ডাক্তার। এ সাবধান তুমি কার জন্যে হতে বলছ?—আমার জন্যে?—না, তোমার নিজের জন্যে?"

মৃদু কণ্ঠে অমিয়া বললে, "তুমি রাগ করছ প্রবীরদা, কিন্তু নিজের জন্যে সাবধান হওয়া কি খুব একটা গর্হিত কাজ? লোকে কথায় বলে, সাবধানের বিনাশ নেই।"

প্রবীর বললে, "খুব ভাল কথা। অতি সাবধানী হয়ে তুমি অবিনশ্বর হও। একটা কথা তোমাকে বলি অমিয়া, প্রবীর রায় সব কিছু করতে পারে, পারে না শুধু বিয়ের জন্যে সাধাসাধি করতে। সুতরাং বিদায়।" ব'লে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

তারপর পুনরায় চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললে, "আরও একটা কথা ব'লে যাই। যে আঘাত অনর্থক তুমি আমাকে দিলে, তার প্রতিশোধ আমি নোব। কেউটে সাপকে বর্শা দিয়ে বিঁধলে কেউটে সাপ কি করে জান? নিজের দেহ নিজে দংশন করে। আমিও তাই করব। এই ফাগুন মাসেই বিয়ে করব। কাকে, বলতে পার?"

স্খলিত মৃদু কণ্ঠে অমিয়া বললে, "বোধ হয় কমলাকে।"

প্রবীর বললে, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, কমলাকে। তাতে প্রতিশোধটা একটু বেশী রকম রঙিন হয়ে উঠবে না কি অমিয়া?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে অমিয়া বললে, "মনে তো হয় না। আমি

যখন হাতে পেয়ে তোমাকে ছেড়ে দিলাম, তখন কমলাকেই বিয়ে কর আর অমলাকেই কর, তাতে আমার এমন কি এসে যায় ?”

প্রবীর বললে, “যায় বইকি অমিয়া, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলে কিছু ইতর-বিশেষ হয়ই।” এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ নেত্রে অমিয়ার প্রতি চেয়ে থেকে পুনরায় বললে, “কোনো জায়গায় তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে কি অমিয়া ?”

নতনেত্রে অমিয়া নিঃশব্দে ব’সে রইল।

“বল না, লজ্জা কিসের !”

মৃদুস্বরে অমিয়া বললে, “এক জায়গায় হচ্ছে।”

“পাকাপাকি হয়ে গেছে ?”

“প্রায়।”

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রবীর বললে, “বাঃ ! বাঃ ! তবে আর দুঃখ কিসের ? তা হ’লে তো অমিয়া-নাটক শেষ পর্যন্ত মিলনান্ত নাটকেই দাঁড়াবে। প্রবীরের কিন্তু সে নাটকের চতুর্থ অঙ্কেই নিষ্ক্রমণ।” ব’লে প্রস্থানোদ্যত হ’ল।

“প্রবীরদা !”

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রবীর বললে, “আবার পেছু ডাক কেন ?”

“একটু দাঁড়াও, একটা প্রণাম করি।”

অমিয়ার কথা শুনে হেসে উঠে প্রবীর বললে, “ওহো-হো ! তাও তো বটে ! এও যে অভিনয়ের একটা দস্তুর ! ছেড়ে যাচ্ছিল !”

প্রণাম ক’রে উঠে মৃদু হেসে অমিয়া বললে, “অমিয়া-নাটক ভারি কঠিন নাটক প্রবীরদা। অনেক শক্ত অভিনয় এতে আমাকে করতে হ’ল।”

“আর, করেছও চমৎকার ! একটা স্বর্ণপদক দাবি করতে

পার। প্রেম নেই, প্রণয় নেই, ভালবাসা নেই; অথচ আছে তার পরিচ্ছন্ন অভিনয়!” প্রজ্বলিত হুতাশনের মতো প্রবীর সবেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

৫

সে রাত্রে এক মুহূর্তও প্রবীর চোখের পাতা বুজতে পারলে না। সারা রাত্রি অনিদ্রায় কেটে গেল অগ্নিগর্ভ চিন্তার দহনে। কি স্থূল আর ক্লেদাক্ত এই নিষ্প্রাণ পৃথিবীখানা! প্রবীরের ইচ্ছা হচ্ছিল, দু হাতে চেপে ধ'রে এই নির্মম পৃথিবীটাকে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেয়।

সহসা এক সময়ে মনে প'ড়ে গেল কমলাকে। ঘন লালসার মতো একটা-কোনো আঠালো বস্তু তার মনকে অধিকার ক'রে বসল। অধীরোদ্যত হৃদয়ের মধ্যে চপল সুরে ধ্বনিত হতে লাগল,—এস, এস, কমলা। তোমার দেহ আর রূপ নিয়ে এস। মন কিন্তু সযত্নে আবৃত ক'রে রেখো রূপের স্বর্ণপেটিকার মধ্যে। মনের কারবারে দ্বিতীয় বার দেউলে হবার আশঙ্কায় আর কিছুতেই প্রবেশ করা নয়। অপমানকর অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানের ক্ষোভে ভাবপ্রবণ প্রবীরের সমস্ত অন্তঃকরণ বিষাক্ত হয়ে উঠল।

সকালে উঠেই সে আত্মনিয়োগ করলে প্রতিশোধের ব্যবস্থা-বিধানে। হিংসা-কঠিন মনকে শান্ত হবার অবকাশ দেওয়া হবে না। প্রতিশোধের যে নিষ্ঠুর অস্ত্র আঘাত করবার জন্য উদ্যত হয়েছে, তার দু দিকে দুই ফলক; এক দিকের ফলক বিদীর্ণ করবে অমিয়াকে, অপর দিকের নিজেকে। প্রেম পুড়ে গিয়ে তার ভস্ম থেকে হিংসার যে তীক্ষ্ণ অঙ্কুর উদ্গত হয়েছে, সযত্নে বর্ধিত করতে হবে তাকে।

প্রবীরের যে আত্মীয়ের দ্বারা কমলার পিতা প্রবীরের সহিত কমলার বিবাহের চেষ্টা করেছিল, তার কাছে লোক মারফৎ প্রবীর চিঠি পাঠালে। সে চিঠির উত্তরে অবিলম্বে প্রবীরের কর্মচারীর সহিত কমলার পিতা, প্রবীরের আত্মীয় এবং আরও কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হ'ল প্রবীরকে আশীর্বাদ করবার জন্য।

জমিদার-বাড়ির পাকা নহবৎখানায় নহবৎ বেজে উঠল। গ্রামের আকাশকে পরিব্যাপ্ত ক'রে সানাইয়ের করুণ-মিষ্ট স্বর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জমিদার-গৃহের সংস্কারকার্যে রাজমিস্ত্রি নিযুক্ত হ'ল। প্রজাদের বসবার জন্য বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রশস্ত চন্দ্রাতপ নির্মিত হবে; তার জন্য বাঁশ, শালের খুঁটি প্রভৃতি উপকরণ এসে পড়তে লাগল। বিবিধ কর্তব্যের ভার গ্রহণ করবার জন্য জমিদার-গৃহে হাজির হতে আরম্ভ করলে বিভিন্ন প্রজার দল। সমস্ত গ্রামখানা আনন্দ-কোলাহলে চকিত হয়ে উঠল। উৎসব-আয়োজনের এই গোলমালের মধ্যে আলো-অন্ধকার-মাখা এক ধূসর সন্ধ্যায় একদিন ছই-ঘেরা একখানা গরুর গাড়িতে আরোহণ ক'রে অমিয়ার পিতা-মাতা ও অমিয়া কলিকাতার পথে রওয়ানা হ'ল।

কথাটা প্রবীরের অগোচর রইল না। তার অধরপ্রান্তে একটা নির্মম হাস্যের অস্পষ্ট রেখা ঝিলিক মেরে গেল। মনে মনে সে বললে, পালিয়ে পরিত্রাণ পাবে মনে করেছ অমিয়া? ডাকঘরের কল্যাণে যথাসময়ে আমার মর্মন্তুদ বাণ তোমার কাছে উপস্থিত হবে।

বিবাহের দিন পাঁচেক পূর্বে প্রবীর অমিয়ার মামার বাড়ির ঠিকানায় সাদা খামে ভ'রে একখানা জমকালো-ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র অমিয়ার নামে পাঠিয়ে দিলে। চিঠির তলদেশে নিজহস্তে যোগ করলে,—"পালিয়ে গেলে অমিয়া? গ্রামে থাকলে কমলার বাসর-ঘরে তোমাকে টেনে নিয়ে এসে গান গাইয়ে ছাড়তাম।—প্রবীর।"

এই প্রবীরের মর্মন্তুদ বাণ।

এই চিঠির উত্তর অবশ্য প্রবীর প্রত্যাশা করে নি। এক মাসের অধিক হ'ল কমলার সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেছে, এর মধ্যে অমিয়ার কোন সংবাদও সে পায় নি। একদিন কলিকাতার চিঠিপত্র দেখতে দেখতে হাতে পড়ল একটা খামে-মোড়া চিঠি। উপরের ঠিকানা অমিয়ার হাতের অক্ষরে। খাম থেকে চিঠি বার ক'রে প্রবীর পড়তে লাগলে—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

প্রবীরদা, তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। তুমি যে শুধু লিখেছ, আমি সেখানে থাকলে কমলার বাসর-ঘরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে গান গাইয়ে ছাড়তে,—নাচিয়ে ছাড়তে, সে কথাও যে লেখ নি, তার জন্যে আমি সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। নির্মম হতে গিয়েও তুমি আমার প্রতি খানিকটা করুণা করেছ।

তোমার বিয়ে তো হয়ে গেল। আমিও ফাঁকি পড়ছি নে; আমার বিয়ের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। রাজরাজড়ার ঘরে আমার বিয়ে। পাত্র কে জান? দণ্ডপাণি শ্রীশ্রীযমরাজ। বাসর কোথায় হবে জান? গঙ্গার উপকূলে নিমতলার ঘাটে। তোমার বিয়েতে তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছ; আমি কিন্তু তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পেলাম না। যা sentimental তুমি, আমার বাসর-ঘরে ব'সে হয়তো এমন শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়তে আরম্ভ করবে যে, আমার শ্বশুর-বাড়ি যাওয়ার সমস্ত পথটা তার বাষ্পে বিষিয়ে উঠবে।

তুমি সেদিন বলছিলে—এ সংসারে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই। আছে প্রবীরদা, নিশ্চয় আছে। না যদি থাকত, সেদিন কি তোমার সামনে অমন 'পরিচ্ছন্ন' অভিনয় করতে পারতাম? যে দিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, তার আগে আমার তিন দিন রক্ত-বমি হয়ে গেছে।

কানাই ডাক্তার আমাকে সংসারের সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। ভগবানের অসীম দয়ায় তুমি এই ভীষণ রোগের সম্ভাবনা থেকে মুক্তি লাভ করেছ, আমি কি তোমার সঙ্গে মাখামাখি ক'রে আবার তোমাকে বিপদের মুখে টেনে আনতে পারি?

সুতরাং এখন বুঝতে পারছ, সে দিন যা-কিছু বলেছিলাম, সবই নিজের অসুখের কথা ভেবেই বলেছিলাম। তোমার অসুখের কথা ভেবে সাবধান হয়ে অবিনশ্বর হবে, এত সামান্য তোমার অমিয়া নয়।

কমলাকে তুমি বিয়ে করায় আমি সত্যিই অতিশয় সুখী হয়েছি। এর দ্বারা আমার প্রতি তোমার গভীর প্রেমের মাপ জানতে পেরেছি। কমলার পরিবর্তে তুমি যদি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে, তা হ'লে ভারি গোলে প'ড়ে যেতাম। এ আমার অন্তরের কথা। মনে যেন ভেবো না, যাবার সময়ও চিঠিতে অমিয়া আর-একটা অভিনয় ক'রে গেল।

এ জন্মে তোমাকে পেলাম না, পরজন্মে যেন পাই, এ রকম নাটুকেপনার আবদার তোমার কাছে করলাম না। এ জন্মেই তোমাকে পেয়েছি, তাই আমার এ-জন্মের দেবতার পদে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি।

লাবণ্যদিদি আমার অনুরোধ মতো এ চিঠিখানা আমার মৃত্যুর পরদিন ডাকে ফেলবেন। সুতরাং তুমি যখন আমার এ চিঠি পাবে, তখন আমি ইহলোকের কেউ নই।

আমার শেষ অনুরোধ, এ চিঠিখানা প'ড়ে ছিঁড়ে ফেলে কার্বলিক সাবান দিয়ে বেশ ক'রে দু হাত ধুয়ে ফেলো। ইতি

তোমার অমিয়া

*   *   *

প্রবীরের জীবনে চন্দ্র-সূর্যের অতিরিক্ত তৃতীয় জ্যোতিষ্ক আবার একবার নিবে গেল।

আশ্বিন ১৩৬০

রামের সুমতি

১

মহানিদ্রায় নিদ্রিত হবার কিছু পূর্বে পুত্রবধূ সুভদ্রার প্রতি ক্লান্ত চক্ষুর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দ্বিজেন মিত্র একান্তে বলেছিল, "বউমা, বরেনকে সহ্য ক'রো।"

ঘাড় নেড়ে সুভদ্রা বলেছিল, "নিশ্চয় করব বাবা।"

বরেন তখন অষ্টাদশ বর্ষীয় স্বাধীন যুবক, বছর চারেক লেখাপড়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে মাতব্বর ব'নে বসেছে; আর, তার একমাত্র সহোদর, জ্যেষ্ঠ হরেন্দ্রনাথ এম. এ. ও আইন পাস ক'রে বছর তিনেক আলিপুরে ওকালতি করছে। অনিশ্চিত ওকালতি ব্যবসায়ের সুদুর্লভ ভাগ্যলক্ষ্মী এই অল্প সময়ের মধ্যেই হরেন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হতে আরম্ভ করেছেন। তিন বৎসরে যে পসার সে জমিয়েছে, অনেকের ভাগ্যে সারাজীবনেও তেমন জমে না।

চেতলা থেকে মাইল দেড়েক দক্ষিণে আতরপুরে হরেন্দ্রনাথদের বাস। যে সময়ের কথা বলছি, কলিকাতা নগর তখনো স্থাবরতার নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে দেহসম্প্রসারণের জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করতে আরম্ভ করে নি। সুতরাং পথঘাটের অভাবে যানবাহনের সুযোগ থেকে দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র নগণ্য আতরপুর গ্রাম, তার নামমাহাত্ম্য সত্ত্বেও, পচা গোবরের দুর্গন্ধ, মশা-মাছির ভন্‌ভনানি, ভেকের মক্‌মকানি আর শৃগালের প্রহর গণনার অপকৃষ্টতার মধ্যে তখনও জড়ীভূত। এমন বিশ্রী জায়গায় শুধু প্রাণটা কোনো রকমে দেহে বজায় রাখবার জন্যেই জীবন-যাপন চলে।

কলিকাতার ধনীকন্যা তখনকার দিনের পক্ষে উচ্চশিক্ষিতা আই.এ.-পাস সুন্দরী সুভদ্রা এ-হেন আতরপুরে মাত্র মধ্যবিত্ত এক সংসারের বধূ হয়ে যেদিন প্রথম এসেছিল, সেদিন সকলেই, মায় হরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত, এই দুষ্পাচ্য অসামঞ্জস্য উপলব্ধি ক'রে একটু উদ্বিগ্ন বোধ করেছিল; করে নি শুধু সুভদ্রা। তখন আবার শ্রাবণ মাস; চতুর্দিক বর্ষার জলে থই থই করছে, কাঁচা উঠানে কেঁচো আর কেন্নোর অবারিত কিলিবিলি, নিরবসর ব্যাঙের কলরবে আর বৈকাল থেকে শৃগালের ডাকে গ্রাম্য নীরবতা বিপর্যস্ত।

দু-চার দিন পরে একদিন একটু ভয়ে ভয়েই হরেন সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আতরপুর তোমার কেমন লাগছে সুভদ্রা?"

সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল সুভদ্রা, "ভাল লাগছে।"

"এই ব্যাঙ ডাকা শেয়াল ডাকা সত্ত্বেও?"

"কিন্তু শুধু ব্যাঙ আর শেয়ালই তো এখানে ডাকে না—তুমিও তো ডাকো।"

সুভদ্রার উত্তর শুনে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে হরেন্দ্র বলেছিল, "বল কি সুভদ্রা! আমিও ডাকি?—হাম্বা রবে না-কি?"

হরেনের কথায় হেসে ফেলে সুভদ্রা বলেছিল, "না না, হাম্বারবে ডাকো না;—কিন্তু ইসারায় ইঙ্গিতে, এমন কি, গলা-খাঁকৃরি দিয়েও ডাকো। তোমার গলা-খাঁকৃরির ডাকের সঙ্গে মিশে ব্যাঙের ডাক সুরেলা হয়ে ওঠে।"

সাহস পেয়ে হাসিমুখে হরেন বলেছিল, "তোমার বদান্যতার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু ধর, তোমার যদি—"

হরেনকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে সুভদ্রা বলেছিল, "তা হ'লে এতটা খুশী হতাম না। আচ্ছা, তোমার এ কুণ্ঠা কতদিনে যাবে

বল তো? সম্মুখসমরে সমীর ঘোষকে পরাজিত ক'রে সুভদ্রাহরণ করেছ—তুমি তো অর্জুন। তোমার এত সঙ্কোচ কিসের?"

২

প্রসঙ্গ নির্দেশ ক'রে সুভদ্রাহরণের একটু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে।

হরেন্দ্র যখন কলিকাতায় মেসে থেকে এম. এ এবং ল অধ্যয়ন করে, তখন প্রবোধ বসু তার সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রবোধ সর্বদাই মেসে এসে হরেন্দ্রের সঙ্গে আড্ডা দিত ও তাকে নিজেদের গৃহে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করত। কিন্তু ধনীগৃহের আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলা সহজ হবে না আশঙ্কা ক'রে নানা ছলে-ছুতোয় হরেন্দ্র তার উপরোধ-অনুরোধ কাটিয়ে দিত। অবশেষে একদিন যখন প্রবোধচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ বহন ক'রে জোর আহ্বানলিপি এল, তখন আর ধনীগৃহের নিঃশ্বাসরোধক আবহাওয়ার আপত্তি বজায় রাখা গেল না।

রোগীর কক্ষে উপনীত হয়ে হরেন দেখলে, শয্যার উপর সোজা হয়ে ব'সে প্রবোধ একটি যুবক আর একটি তরুণীর সঙ্গে রহস্যালাপে রত। লক্ষণ দেখে রোগটা সাংঘাতিক মনে হ'ল না।

পরিচয় পেয়ে জানলে তরুণীটি প্রবোধের ছোট বোন সুভদ্রা, আই.এ.-পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রী এবং যুবকটি প্রবোধের বন্ধু সমীর ঘোষ—ধনকুবের শিশির ঘোষের একমাত্র পুত্র, আই. এস-সি. পরীক্ষায় বার দুই ফেল ক'রে তিন পুরুষের পৈতৃক কারবারে বসতে আরম্ভ করেছে। উপস্থিত অফিস তাকে মাসিক ভাতা দিচ্ছে সাড়ে সাত শো টাকা—কথায় কথায় সে কথাও জানা গেল।

বিলম্বিত পরিচয়ে হরেন আরও জানতে পেরেছিল, পৈতৃক কারবার

থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে সমীর প্রায় প্রতিদিন প্রবোধদের বাড়িতে হাজিরা দেয়—বলা যেতে পারে, সেও অপর এক কারবারেরই তাগিদে। এ পর্যন্ত সে কারবারে সমীর ঢেলেই চলেছে, প্রত্যাগমের বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবে সুভদ্রার বাপ ও মার, বিশেষত মার, এ বিষয়ে জোর পৃষ্ঠপোষকতা আছে ব'লে ভরসা হয় শেষ পর্যন্ত কারবারে লক্ষ্মীলাভ হতে পারবে।

ঘণ্টা দুই অবস্থানের পর হরেন বিদায় চাইলে প্রবোধ জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাল আসছিস তো হরেন ?"

অকারণ একটু বিবেচনা করার অভিনয় ক'রে হরেন উত্তর দিয়েছিল, "কাল ? আচ্ছা, আসব।"

পরদিন বৈকালে কথামতো হরেন ঠিক উপস্থিত হয়েছিল। সমীর কিন্তু সেদিন আসতে পারে নি। দ্বিতীয় দিনে তিন জনের আড্ডা দেখতে দেখতে যেমন জ'মে উঠেছিল, প্রথম দিনে চার জনেও তেমন জমাতে পারে নি। বিদায় গ্রহণের জন্য হরেন উঠে দাঁড়ালে দেখা গিয়েছিল, আড্ডার চাকার মসৃণতার গুণে তিন ঘণ্টা কাল অজ্ঞাতসারেই অতিবাহিত হয়েছে।

হরেনকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাল বৈকালে আসছেন তো ?"

হরেন উত্তর দিয়েছিল, "আসছি নে বলবার ঠিক জোর পাচ্ছি নে।"

সুভদ্রা বলেছিল, "আপনাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসবার জন্যে দাদা তো সর্বদা টানাটানি করতেন, তখন কেন আসতেন না বলুন তো ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে হরেন বলেছিল, "সুভদ্রা এ বাড়িতে থাকে জানতাম না ব'লেই বোধ হয়।"

হাসিমুখে সুভদ্রা উত্তর দিয়েছিল, "আমি কিন্তু জানতাম আপনি মেসে থাকেন। আপনার বিষয়ে দাদার মুখে আমার এত কথা শোনা আর জানা ছিল যে, কাল যখন আপনি এসেছিলেন, আপনাকে একটুও অজানা মনে হয়নি।"

এরপর এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

৩

সুভদ্রার শ্বশুর দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিল একজন সেকেলে নামজাদা হেডমাস্টার। সুভদ্রার বিবাহের কিছু পূর্বে পত্নীহারা হয়ে সে অবসর গ্রহণ করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ শুধু বিদ্বানই ছিল না, সাংসারিক জ্ঞান এবং মনুষ্য-চরিত্রবোধে সে ছিল প্রবীণ মানুষ। বরেন যে সুভদ্রাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারছে না, এ কথা উপলব্ধি করতে তার বেশী বিলম্ব হয়নি। তাই মৃত্যুকালে সহ্য করবার ভার সুভদ্রার উপরই দিয়ে গিয়েছিল। সুভদ্রার উদারচিত্ততা এবং কর্তব্যপরায়ণতার যে পরিচয় সে পেয়েছিল, তার দ্বারা সে বিশ্বাস করত উদ্ধত এবং দুর্দম বরেনকে মানিয়ে নিয়ে চলবার তিতিক্ষা সুভদ্রার আছে।

সুভদ্রার প্রতি বরেনের বিদ্বেষের কারণ ছিল একাধিক। প্রথমতঃ তার চেয়ে মাত্র তিন বৎসরের বড় একটা মেয়ে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাস করার প্রভা নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে লোকচক্ষুর সম্মুখে তার মূর্খতার কালিমাকে আরও খানিকটা প্রকট ক'রে দিয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ ঐ ঘৃণিত বিদ্যাবত্তার প্রভাবেই সে তার পিতার অনেকখানি স্নেহ অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল; এবং তৃতীয়তঃ, শুধু স্নেহই নয়,

পিতার দৈনিক সংসার-খরচের হিসাবপত্র টাকাকড়িও অধিকার করেছিল পিতার ধর্মগ্রন্থ পাঠের সময় ও সুবিধা বাড়িয়ে দেবার কৌশলের দ্বারা। পিতার হাতে খরচ থাকার সময়ে চুরুটটা-আসটার জন্য চার আনা পয়সা থেকে চার পয়সা উপার্জন করা কতকটা সহজেই চলত। সুভদ্রার আমলে একটা পূর্ণ টাকা থেকে চার পয়সার সুবিধা করতে ঘাম ছুটে যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে কেমন যেন একটা হীনতাবোধের প্রভাবে বরেনের কেবলই মনে হয়, সুভদ্রার কর্তৃত্ব ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠেছে। তার ফলে তার মন ওঠে বিষিয়ে, উচ্ছৃঙ্খলতা যায় বেড়ে।

একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর বরেন বেরিয়ে যাবার উপক্রম করছে। সুভদ্রা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপো, কোথায় যাচ্ছ ?"

কিছু আগে একটা কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে একটু তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বরেন বললে, "যেখানে যাচ্ছি, সেখানে।"

"আচ্ছা, সেখানেই যেয়ো। কিন্তু লক্ষ্মী ভাই, যাবার আগে একটা কথা শোন।"

"কথা, না, হুকুম ?"

"না, হুকুম নয়, কথাই। বুদ্ধির তো অভাব নেই তোমার, আচ্ছা, এই উদ্দেশ্যহীন জীবন ছেড়ে দিয়ে একটু লেখাপড়ায় মন দাও না !"

বরেন হেসে উঠল, "লেখাপড়ায় মন দোব ! লেখাপড়া হবে আমার ব'লে তুমি বিশ্বাস কর ?"

"কেন হবে না ! তোমার দাদার কেমন ক'রে হয়েছে ?"

"দাদার কথা ছেড়ে দাও, দাদার মাথার ওপর বাপ-মা ছিল। আমার কে আছে ?"

"কেন, তোমার দাদা আছেন, আমি আছি। লোকে কথায় বলে বড় ভাই বাপের মতো।"

বরেনের মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। বললে, "বড় ভাই বাপের মতো না-হয় মানলাম, কিন্তু, কিছু মনে ক'রো না, সঙ্গে যে সৎমার মতো বড় ভাজও আছে।"

শান্ত কণ্ঠে সুভদ্রা বললে, "পরীক্ষাই ক'রে দেখ না একবার সৎমাকে, বোধ হয় সৎমাকে খুব অসৎ ব'লে মনে হবে না। কখনো কখনো সৎমা আপন মার চেয়েও সৎ হয়।"

কোনো উত্তর না দিয়ে বরেন মুখ গোঁজ ক'রে রইল।

সুভদ্রা বললে, "তোমাকে আমি ইস্কুলে ক্লাস সেভেনে নাম লিখিয়ে পড়তে বলছি নে। তোমার দাদা ব্যস্ত মানুষ, সময় নেই—আমি তোমাকে যত্ন ক'রে পড়াতে পারি ঠাকুরপো।"

"তুমি! তুমি পড়াবে! যদি পড়তেই হয় এম. এ. পাস কোনো লেখাপড়া জানা লোকের কাছে পড়ব। তুমি আই. এ -পাস মেয়েছেলে, তুমি কি পড়াবে?"

সুভদ্রার মনে প'ড়ে গেল, রবীন্দ্রনাথের কাঁসার ঘটির অনুযোগ, 'কূপ, তুমি কেন খুড়া হ'লে না সাগর!' বললে, "আমি তো সব সাবজেক্ট পড়াব না তোমাকে—শুধু ইংরিজী, বাংলা আর সামান্য একটু অঙ্ক। আমার কাছে এক-আধখানা বই শেষ কর, তারপর এম. এ.-পাস মাস্টারের সন্ধান করা যাবে।"

"কিন্তু এ লেখাপড়া শেখার ফল কি হবে শুনি? মোটা ভাত মোটা কাপড় আর পনের টাকা মাস মাইনের তোমাদের মুহুরিগিরি তো?"

চকিত স্বরে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের মুহুরিগিরি মানে?"

বরেন বললে, "আচ্ছা, তোমার স্বামীরই না হয় হ'ল।"

"কিছু মনে ক'রো না ঠাকুরপো, তোমার কথার উত্তরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার স্বামীকে বাদ দিয়ে এই মোটা ভাত মোটা কাপড় আর মাসিক পনেরো টাকা মাইনে উপার্জন করবার মতো শক্তি তোমার আছে তো?"

"আছে। এই বাড়ির অর্ধেক অংশ বিক্রি ক'রে আমি ব্যবসা করতে পারি।"

"এর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু সে সব কথা উপস্থিত বাদ দিয়ে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। এই ভদ্রাসন বাড়ি, মায় জমি বাগান পুকুর সমস্ত তিন হাজার টাকায় ছোটঠাকুরঝির বিয়ের দেনায় বাঁধা আছে তা জান?"

"সে টাকা দাদা শোধ করবে।"

"সে টাকা দাদা শোধ করলে সমস্ত বাড়িটা দাদার হয়ে যাবে। অর্ধেক অংশ তোমার হতে হ'লে দেড় হাজার টাকা তোমাকে শোধ করতে হবে।"

বরেন খেঁকিয়ে উঠল, "আইন দেখাচ্ছ আমাকে? তোমাদেরও আইন দেখাবার লোক আমার আছে।"

সুভদ্রা বললে, "তা-ও জানি। মহা আইনজ্ঞ বিষ্টু হাজরা তোমার পরামর্শদাতা। সাবধান ঠাকুরপো! সর্বনেশে লোক ঐ বিষ্টু হাজরা। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেবে। কি দরকার ভাই, বিষ্টু হাজরার পরামর্শে, বাড়ির মধ্যে এমন একজন উদারহৃদয় আইনজ্ঞ থাকতে?"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে বরেন বললে, "ও! তুমি বুঝি তা হ'লে আজ রঙ চড়িয়ে এ সব কথা দাদাকে লাগাবে?"

সুভদ্রা হেসে ফেললে, "এত কম বোঝ ঠাকুরপো? এটুকু বুদ্ধিও

তোমার নেই ? আমি যদি লাগতাম তা হ'লে তোমাকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু কৈফিয়ৎ দাদার কাছে দিতে হ'ত।—একদিনও দিয়েছ কি ?"

বরেন বললে, "লাগাও তুমি, কিন্তু দাদা তোমার কথা বিশ্বাস করে না।"

"খোকাকে দুধ খাওয়াবার সময় হ'ল, আমি চললাম ঠাকুরপো।" ব'লে সুভদ্রা প্রস্থান করলে।

দু-চারদিন অন্তর এই রকম একটা-না-একটা খিটিমিটি চলতেই লাগল।

৪

মাস তিনেক পরের কথা।

ছুটির দিন। সন্ধ্যার পর হরেন বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছে। বিষ্ণু হাজরা তার বাড়ির দাওয়ায় ব'সে তামাক খাচ্ছিল, হরেনকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললে, "হরেন, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল বাবা।"

বিষ্ণু হাজরা যে তার বিরুদ্ধে বরেনকে উত্তপ্ত করার সৎকার্যে আত্মনিয়োগ করছে, সে কথা হরেনের অবিদিত ছিল না; নিরস অনুৎসুক কণ্ঠে বললে, "কি কথা ?"

"একটু দাওয়ায় গিয়ে বসবে ?"

"আজ্ঞে না; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনি।"

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে অকারণ কণ্ঠস্বর খানিকটা নীচু ক'রে নিয়ে বিষ্ণু হাজরা বললে, "ছোঁড়াটার যা হয় একটা গতি কর বাবা।"

রুক্ষকণ্ঠে হরেন বললে, "ছোঁড়াটা কে ?"

"তোমার ভাই বরেনের কথা বলছি।"

"তা, ছোঁড়া বলেছেন কেন ?"

এই বেমক্কা অসুবিধাজনক প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে বিষ্ণুচরণ বললে, "আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করে, মায়া হয় ওর ওপর—তাই বলছি।"

"দেখুন, আপনার মায়া হয়, আমার কিন্তু হয় না। সুতরাং আপনিই ওর গতি করুন।"

প্রস্তাব শুনে চকিত কণ্ঠে বিষ্ণুচরণ বললে, "আমি ! আমি কি গতি করব ?"

সহজ স্বরে হরেন বললে, "কেন, পার্টিশন স্যুট আর অ্যাকাউণ্ট স্যুট দায়ের করা থেকে আরম্ভ ক'রে সম্পত্তি আর টাকা পাইয়ে দেওয়া পর্যন্ত সব। শুনুন হাজরা মশায়, একটা স্পষ্ট কথা আপনাকে বলি। আতরপুর থেকে আলিপুরে ওকালতি করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। মাঝে মাঝে মনে করি ভবানীপুরে কিংবা কালীঘাটে বাসা ভাড়া নিয়ে উঠে যাই ; শুধু গ্রামটার প্রতি মায়াবশত পারি নে। কিন্তু আর নয়, কালই আমি ভবানীপুরের দিকে বাড়ি ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করছি। বাসা পেলেই বরেনকে এখানকার বাড়ি ঘর-দোর বাগান জমি-জমা সব ছেড়ে দিয়ে মাস দুয়েকের খরচা দিয়ে, আর আপনাকে ওর মুরুব্বি হবার পরিপূর্ণ সুযোগ দান ক'রে সপরিবারে আমি চ'লে যাব।"

বিষ্ণুচরণ খ্যাঁক ক'রে উঠল, "আমি ওর মুরুব্বি হতে যাব কেন ?"

"আপনার ওর প্রতি মায়া পড়েছে, আর আপনি ওর গতি করবেন ব'লে।"

"কিন্তু আমিও তোমাকে বলছি—"

বিষ্ণুচরণকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হরেন বললে, "আগে আমাকে

কথা শেষ করতে দিন। দু মাস পরে যখন দেখবে শ্যাম ভবানীপুরে স'রে পড়েছে, আর কুল রাখবার কোনো ব্যবস্থাই আপনি করছেন না, তখন সাংঘাতিকভাবে ও আপনার ওপর চড়াও হবে।···একটা হিতকথা শুনবেন হাজরা মশায় ?"

কোনো উত্তর না দিয়ে বিষ্ণু হাজরা তীক্ষ্ণনেত্রে হরেনের প্রতি তাকিয়ে রইল।

"আমাদের আতরপুরের সম্পত্তি এখন ঝাঁঝরা মৌচাক, এক ফোঁটা মধু এ থেকে নিঙড়ে বার করবার উপায় নেই।"

কর্কশকণ্ঠে বিষ্ণু বললে, "কেন ?"

"কানায় কানায় দেনায় ভরা।"

"তুমি সম্পত্তি দেনা থেকে মুক্ত কর নি কেন ?"

"সেটা একান্ত ভাবে আমার খুশি বলে।"

"কিন্তু বাবা, শহরে নিজের স্ত্রীর নামে জমি কিনছ, আর এ দিকে নাবালক ভাইয়ের সম্পত্তি দেনায় ডুবিয়ে রেখেছ, এ খুশি তো ভাল খুশি নয় : আর এ কাজও পাকা কাজ নয়।"

"আইনের উপদেশ আমি আপনার কাছ থেকে পরে নোব—আপাতত একটা কথা বলি। ধর্মগ্রন্থ পড়বেন ? কিছু বই পাঠিয়ে দোব ? রামায়ণ ?—মহাভারত ?—গীতা ?"

ফোঁস ক'রে উঠল বিষ্ণু, "তুমি আমাকে অপমান করছ হরেন !"

"এ কথা আপনি ঠিকই বলেছেন। ধর্মগ্রন্থ পড়বার অনুরোধ করলে আপনাকে অপমান করাই হয়।" ব'লে হরেন দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

গৃহে পৌঁছে একটু উত্তেজিত ভাবেই সে সুভদ্রাকে বললে, "না সুভদ্রা, আর এখানে আমাদের থাকা চলবে না। কালই আমি ভবানীপুরে কিংবা কালীঘাটে বাসা দেখে দেবার জন্যে বন্ধুদের অনুরোধ ক'রে আসব।"

ঈষৎ চিন্তিত হয়ে সুভদ্রা বললে, "কেন, আবার কি হ'ল ?"

পথে বিষ্ণু হাজরার সঙ্গে যা ঘটেছিল আনুপূর্বিক সকল কথা ব'লে হরেন বললে, "না, এ অসহ্য হয়েছে! এ দূষিত হাওয়া ছেড়ে যেতেই হবে।"

"কিন্তু তাই ব'লে ঠাকুরপোকে এখানে ফেলে রেখে ?"

"তোমার ঠাকুরপোর অশিষ্টতাও ক্রমশ অসহ্য হয়েছে। ওর একটু শিক্ষা হওয়া দরকার!"

"ওকে দূরে রাখলে শিক্ষা হবে না, কাছে রাখলেই হয়তো হতে পারবে।"

"তা হ'লে কাছেই রাখ। ধন্য তোমার সহ্যশক্তি সুভদ্রা! আমার আগে তোমারই ওটাকে অসহ্য হওয়া উচিত ছিল। ওর কত উৎপীড়ন তোমাকে সহ্য করতে হয়, গোলাপের কাছে তা জানতে আমার বাকি নেই।"

গোলাপ সংসারের পুরনো ঝি।

রুষ্টকণ্ঠে সুভদ্রা বললে, "গোলাপ বুঝি ঠাকুরপোর নামে তোমার কাছে লাগায় ?"

মাথা নেড়ে হরেন বললে, "না না, ঠাকুরপোর নামে লাগাবে কেন ? তোমার দুঃখের কথা আমাকে জানায়।"

"আমার দুঃখের কথা গোলাপ কি জানে যে তোমাকে জানাবে ?"

হাসিমুখে হরেন বললে, "সে কথা সত্যি। আমি যখন জানি নে, গোলাপ কি ক'রে তা জানবে ?"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সুভদ্রা বললে, "বাবার এত সাধের বাগান পুকুর ভদ্রাসন—এ আমি সহজে ছেড়ে যাব না—বাবার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে তো কোনো বিষ্টু হাজরার জন্যেই নয়।...তা ছাড়া,

যে চমৎকারভাবে বিষ্টু হাজরার জ্ঞানচক্ষু তুমি আজ খুলে দিয়েছ, এ পথ ও নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে।"

সুভদ্রার এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি। বিষ্ণু হাজরার কোনো ক্রিয়াশীলতার কথা আর শোনা যায় না, এমন কি বরেনের মুখেও নয়।

৫

বিষ্ণু হাজরার জটিলতা শেষ হ'লেও, বরেনের মতি-গতির বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল না; এমন কি, দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছর দেড়েক পরে তার উচ্ছৃঙ্খলতা পুনরায় এক নূতন পথ ধ'রে সজোরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বেলা দশটা। আদালত যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে হরেন সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করলে, "বরা এসেছে?"

মাথা নেড়ে সুভদ্রা বললে, "না।" তারপর কতকটা যেন নিজেকেই বলতে লাগল, "সেই কাল দুপুরে দুটো ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়েছে, আর আজ এতটা বেলা পর্যন্ত দেখা নেই। যাত্রা শুনতে হবে তো দুপুরবেলাই বা যাওয়া কেন, আর আজ এখন পর্যন্ত না আসবারই বা কি কারণ আছে!"

বিরক্তিসূচক কণ্ঠে হরেন বললে, "ইদানীং ও আবার বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে। তুমি ওকে ভাল ক'রে শাসন কর সুভদ্রা।"

সুভদ্রা বললে, "আমি শাসন করলে ও মানবে কেন? তোমাকে ভয় করে, তুমি কর।"

হরেন বললে, "আমাকে হয়তো ভয় করে, কিন্তু যতই খিটিমিটি করুক তোমার সঙ্গে, তোমাকে ও ভালবাসে। তোমার কথায় ও সহজে

বশীভূত হবে।" তারপর ব্যস্ত হয়ে বললে, "দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি চললাম।"

"এস।"

হরেন চ'লে গেলে হরেনের কথা ভেবে সুভদ্রা মনে মনে একটু হাসলে—উদার হৃদয় তোমার, কত ভুল-ভ্রান্তিই না করতে পার! শ্বশুর ছিলেন বিচক্ষণ মানুষ, তিনি বুঝেছিলেন কোথায় গলদ। তাই শেষ সময়ে অনুরোধ ক'রে গেছেন ঠাকুরপোকে সহ্য করতে। প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত সহ্য করব। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তার কিছুটাও যদি জানতে, তা হ'লে অমন ক'রে ভালবাসার কথা তুলতে পারতে না।

হরেন প্রস্থান করবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বাড়ির ভিতরে বরেনের কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "গোলাপ, তেল দে।" বোধ হয় হরেনের বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় কাছেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে ছিল।

বরেনের কাছে উপস্থিত হয়ে সুভদ্রা বললে, "এ কি কাণ্ড ঠাকুরপো! কাল দুপুরে গেছ, আর আজ দশটা বেলায় ফিরলে?"

বরেন বললে, "কাণ্ড আবার কি হ'ল শুনি? যাত্রা শেষ হবার পর চা-টা খেয়ে তারপর আসছি, বেহালা থেকে আতরপুর পথটাই কি কম?"

এ কথার উত্তর দেওয়া হ'ল না। হঠাৎ বরেনের মুখ ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে চকিত কণ্ঠে সুভদ্রা বললে, "এ কি ঠাকুরপো! যাত্রায় তুমি সেজেছিলে না-কি!"

"কি ক'রে জানলে?"

"ঠোঁটে লাল রঙ লেগে রয়েছে, আর কানের পাশে পাউডারের ছোপ। ছি-ছি, তুমি যাত্রায় সেজে এলে ঠাকুরপো!"

কাপড়ের খুঁট দিয়ে ওষ্ঠাধর ঘ'ষে দেখে রুক্ষস্বরে বরেন বললে, "ছি-ছি কি রকম? সেজে এসেছি বটে, কিন্তু তা ব'লে হনুমান সাজি নি, দস্তুরমতো রাম সেজে এসেছি—অযোধ্যাপতি দশরথের তনয় রাম।"

তিক্ত বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে সুভদ্রা বললে, "রাম সাজলেও আসলে তুমি হনুমানই সেজে এসেছ। এত বড় সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হয়ে তুমি নিজের মুখে এতটা কালি মাখালে?"

"কালি মাখালে মানে?"

বরেনের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সুভদ্রা বললে, "মাখালে বইকি। বাবা অতবড় নামজাদা হেডমাস্টার ছিলেন, তোমার দাদা এম. এ., বি. এল. পাস ক'রে বড় উকিল হয়ে উঠছেন—আর, তুমি কি-না একটা পেশাদার যাত্রার দলে পার্ট ক'রে এলে?"

দৃঢ়স্বরে বরেন বললে, "শুধু পার্ট ক'রেই আসি নি, পথ ক'রেও এসেছি।" বরেনের মুখের মধ্যে একটা হিংস্র উল্লাসের চাপা হাসি।

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের পথ ক'রে এলে?"

"তোমার সংসার থেকে বেরিয়ে পড়বার পথ। পরশু বিকেল থেকে যাত্রাদলের রামের কলেরার মতো হওয়ায় ওরা ভারি বিপদে প'ড়ে গিয়েছিল। কাকে রাম করবে ভেবে পায় না, সকলেরই হনুমান সাজবার মতো চেহারা। আমি বললাম—আমি সাজব। আমাকে দেখে বললে, চেহারায় মানাবে বটে, কিন্তু কাল রাত আটটায় যাত্রা আরম্ভ—এত অল্প সময়ে তৈরি হতে পারবে কি? বললাম—আলবাৎ পারব। দু দিন চার ঘণ্টা আর চার ঘণ্টা মোট আট ঘণ্টা রিহার্সাল দিয়ে হিরোর পার্টে কাল যা অভিনয় করেছি, ধন্যি ধন্যি প'ড়ে গেছে। সোজা দলে অভিনয় করি নি—শশাঙ্ক অধিকারীর দল! শশাঙ্ক অধিকারী বলেছে, আমি যদি ওর দলে ভর্তি হই তিরিশ টাকা মাইনে

দেবে, আর ওর মেয়েকে যদি বিয়ে করি, দেড় আনার বখরাদার করবে। পথ ক'রে আসি নি? তোমার সংসারে থাকলে তোমার বাজার-সরকার হয়ে তোমার ছেলেমেয়েদের কাঁধে-পিঠে ক'রে মানুষ ক'রে জীবন কাটাতে হবে তো!"

সুভদ্রা বললে, "না, তা হবে না। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তাও তোমার যাত্রাদলের রামচন্দ্রের চেয়ে ভাল। তোমার মঙ্গল যদি কোথাও থাকে, এই সংসারেই তা আছে। আমাকে বিশ্বাস কর ঠাকুরপো, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"তুমি আমাকে ভালবাস?" হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠে বরেন বললে, "তোমার যেমন ভালবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষা! তোমার ভালবাসার কথা আমি এক বিন্দু বিশ্বাস করি নে।" তারপর হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠল, "গোলাপ, তেল দে।"

অন্তরাল থেকে গোলাপ বললে, "তেল গামছা কাপড়—সব রেখেছি।"

সুভদ্রা বললে, "আমিও একবিন্দু বিশ্বাস করি নে ঠাকুরপো, তোমার দাদার কথা। আজ এইমাত্র কাছারি যাওয়ার আগে তিনি একটা ভারি অদ্ভুত কথা বলছিলেন,—বলছিলেন তুমি নাকি আমাকে ভালবাস। শুনে আমি মনে মনে হেসে বাঁচি নে; যে আমাকে সৎমা মনে করে, যে মনে করে আমি তাকে মুহুরি বানাবার চেষ্টায় আছি, শোন কথা, সে আমাকে ভালবাসে! সে তো অহরহ আমার মৃত্যু কামনা করে; আমি মারা গেলে মুখে একগাল পান ঠুসে যে আমাকে খাটে তুলে পুড়িয়ে এসে বলবে—আপদ বিদেয় হ'ল; তোমার দাদা বলেন, সে আমাকে ভালবাসে!"

সহসা ঝরঝর ক'রে একরাশ জল সুভদ্রার দুই চক্ষু থেকে বৃষ্টিধারার

মতো ঝ'রে পড়ল। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে অপ্রতিভ ভাবে সে বললে, "তুমি কিছু মনে ক'রো না ঠাকুরপো! এ চোখের জল তোমার কোনো কথার জন্যে নয়—এ তোমার দাদার কথার জন্যে। কি অদ্ভুত কথাই না ব'লে গেলেন তিনি!...যাও, তুমি স্নান করগে।"

ধীরে ধীরে সুভদ্রা অন্য দিকে চ'লে গেল।

*　　　*　　　*

বেলা তখন দুটো। একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে নিয়ে সুভদ্রা তার ঘরে শুয়ে আছে, দরজায় ধাক্কা পড়ল।

তাড়াতাড়ি উঠে দোর খুলে সুভদ্রা দেখে, বরেন দাঁড়িয়ে আছে।

"কি ঠাকুরপো?"

বরেন বললে, "বেহালায় চললাম। ওদের সঙ্গে ব্যবস্থা যদি হয়ে যায়, মাস চার-পাঁচ না আসতেও পারি।"

"ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না?"

"না, তুমিই ব'লে দিয়ো।"

সুভদ্রা বললে, "এই যে তোমার অন্যায় আচরণ—অকারণে আমাদের ছেড়ে চ'লে যাওয়া—এও আমি সহ্য করব, কারণ বাবা তোমাকে সহ্য করবার আদেশ দিয়ে গেছেন আমাকে।"

চকিত কণ্ঠে বরেন বললে, "বাবা তোমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন? কবে?"

"শেষ দিনে।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বরেন বললে, "বাবা তা হ'লে তোমাকে চিনতে পেরেছিলেন?"

"হাঁ, পেরেছিলেন।...একটু মিষ্টি আর জল খেয়ে যাও ঠাকুরপো।"

মাথা নেড়ে বরেন বললে, "না, খাবার এখন কোনো দরকার নেই।" ব'লে গমনোদ্যত হ'ল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে খপ ক'রে বরেনের একটা হাত ধ'রে ফেলে সুভদ্রা বললে, "লক্ষ্মী ভাই, একটা কথা আমার রাখো—একটু মিষ্টি আর জল খেয়ে যাও।"

"দাও, দাও।"

একটা রেকাবে চারটে সন্দেশ আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসে সুভদ্রা বরেনের সামনে রাখলে।

একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে খেয়ে জলটা ঢক ঢক ক'রে পান ক'রে বরেন বেরিয়ে গেল।

৬

বেলা চারটে বেজে গেছে। আর অলস হয়ে ব'সে থাকা চলে না। বিষণ্ণ-গভীর মন নিয়ে হাতের গোটা দুই কাজ সেরে সুভদ্রা পুকুরে যাবে, এমন সময় কানে প্রবেশ করল, "বউদি!"

স্বরের নূতনত্বে চমকিত হয়ে চেয়ে দেখে সুভদ্রা বললে, "কি ঠাকুরপো?"

বরেনের মুখে লজ্জা ও হাসির একটা স্তিমিত রসায়ন।

"ফিরে এলাম, বেহালার অর্ধেক পথ থেকে।"

"কেন?"

"রামচন্দ্রের পার্ট আর করব না, এবার থেকে করব লক্ষ্মণের পার্ট।"

"ওদেরই দলে?"

ব্যগ্রকণ্ঠে বরেন বললে, "না না, শশাঙ্ক অধিকারীর দলে নিশ্চয়ই আর নয়; এবার তোমাদের দলে।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, দাদা হবে রামচন্দ্র, তুমি হবে সীতা, আমি লক্ষ্মণ, আর আমাদের এই সংসার হবে অযোধ্যা নগর।"

সুভদ্রার মুখ উল্লসিত হয়ে উঠল।

"সত্যি ?"

"সত্যি।...আচ্ছা বউদি, তুমি লেখাপড়া-জানা পাস-করা শক্ত মেয়ে—তুমি বকবে-ঝকবে, তর্ক করবে। তখন তুমি অমন ক'রে কাঁদলে কেন বল দেখি ? বেহালার পথে যেতে যেতে যতবার তোমার কথা মনে পড়ে, দেখি তুমি কাঁদছ !...আবার ! আবার ! আবার সেই কাণ্ড ! নাঃ ! আজ তুমি কেঁদেই মাত করলে দেখছি !"

আকাশে মাঝে মাঝে রৌদ্র-বৃষ্টির একত্র খেলা দেখা যায়। সুভদ্রার মুখের মধ্যেও অশ্রু-হাসির সেই একত্র খেলা।

আশ্বিন ১৩৬০

বন্যার জল

কান্তিভূষণের বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর।

এই বয়সে সে যদি হেসে খেলে ইয়ার্কি মেরে দিন কাটাত, তা হ'লে অসঙ্গত কিছুই হ'ত না; বরং বয়োধর্ম পালন করাই হ'ত। কিন্তু সর্বপ্রকার চাপল্যের পথ সর্বতোভাবে পরিহার ক'রে গুম্ফশ্মশ্রুপরিকীর্ণ সমস্ত মুখমণ্ডলে সে এমন নির্বিকল্প গাম্ভীর্যের জমাট বাঁধিয়েছে যে, তার ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুর উদ্ধত বড়বাবুয়ানা পর্যন্ত কান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাতজোড় করে।

বস্তুত, কান্তিভূষণের প্রতি বড়বাবুয়ানা ফলাবার কোনো ফাঁকই বড়বাবু খুঁজে পায় না। কান্তি অফিসে আসে সকলের আগে; যায় সকলের শেষে; এক মনে ঘাড় গুঁজে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে বুদ্ধিদীপ্ত নিপুণতার সঙ্গে দশটা-পাঁচটা কাজ করে; ছুটি নেই, কামাই নেই, লেট্ নেই। অফিসের বড় সাহেব ড্রেক্‌ব্রক্‌ম্যান থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট সাহেব চেস্টারটন পর্যন্ত ইংরেজ কর্মচারীগণ 'ক্যাণ্টি' বলতে অজ্ঞান।

গলাবন্ধ কোট, কোঁচা-তোলা ধুতি ও ভোজপুরী নাগরা পরিধান ক'রে কান্তি অফিস যাতায়াত করে। তার মাথায় ঘাড়ের দিকের চুল বেশী লম্বা অথবা সামনের দিকের, তা কাঁচি দিয়ে কেটে পাশাপাশি না রাখলে নির্ণয় করা কঠিন।

বাগবাজার স্ট্রীটের উপর একটা পুরাতন বাড়ির ক্ষুদ্র এক অংশে কান্তি বাস করে। গোকুল নামে ঠিকা এক চাকর সকালে এসে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে একটি মানুষের সংসারের সামান্য যা-কিছু কাজ সেরে

দিয়ে যায়। কান্তি অকৃতদার; সুতরাং পুত্র-কন্যার কথাই ওঠে না। বছর তিনেক পূর্বে তার শেষ আত্মীয় গর্ভধারিণীর মৃত্যু হয়েছে। তার পর থেকে সে একান্তভাবেই একা। পিতৃকুলের ধার ধারে না, মাতৃকুলের খোঁজ রাখে না।

কান্তিভূষণ ভাত খায় এক বেলা। সকালে আধ পাউণ্ড পাঁউরুটি, খানিকটা মাখন, সামান্য কিছু ফল ও গোটা দুই সন্দেশ খেয়ে অফিস যায়। অফিস থেকে ফিরে গোটা দুই রসগোল্লার সঙ্গে এক গ্লাস জল খেয়ে কুকারে চড়িয়ে দেয় ডাল, ভাত, কিছু আনাজ ও হাঁসের ডিম। অফিসে মাহিনা পায় পঁচাত্তর টাকা। তখনকার ঘোড়ায়-টানা ট্রাম আর মানুষে-টানা পাখার সুলভ দিনের পক্ষে এ টাকা সামান্য নয়; সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার চালিয়েও প্রতি মাসে তার হাতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকে।

কান্তি কঠিনভাবে সত্যভাষী, কঠোরভাবে সদাচারী। কোনো প্রকার মানসিক অশান্তির কারণ না থাকলেও সে হাসে কদাচিৎ, কথা কয় অতি অল্প, গল্প বলে না কখনো, শোনে না বাধ্য না হ'লে। কানাই দে নামে ওর এক সহকর্মী আছে,—অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এমন কি অফিসে ব'সেও সে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা দু-পয়সা উপার্জন করে। সে একদিন দু-চার জন বন্ধুর কাছে বললে, "কান্তির অসুখের নিদান শুনবে? আপাতত মনোম্যানিয়া, পরে ইন্‌স্যানিটি।"

২

নেশা বলতে সাধারণত যে সকল ব্যাপার বোঝায়, যেমন পান, তামাক, মদ, আফিম, উপন্যাস পাঠ, থিয়েটার দেখা, সঙ্গীত চর্চা, কান্তির সে সব কিছুই ছিল না; থাকবার মধ্যে একমাত্র ছিল প্রতি

বৎসর একখানা ক'রে ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের দশ টাকার ডার্বি ঘোড়-দৌড়ের লটারির টিকিট কেনার নেশা। গত আট বৎসর নিয়মিত ভাবে সে কিনে আসছে, আর নিয়মিতভাবেই কিছু হচ্ছে না। এই একটানা নিষ্ফলতার বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ ছিল না, অদৃষ্টের প্রতিও সে এজন্য কিছুমাত্র দোষারোপ করত না। যে কারবারের যে ধর্ম তা তো মানতেই হবে। দশবার টোপ ফেললে তবে তো একবার মাছ ওঠে।

কান্তির কিন্তু দশবার টোপ ফেলতে হ'ল না, নবমবারের টোপেই টিকিট উঠল, আর সে সাধারণ যে-সে টিকিট নয়, রীতিমত নামী ঘোড়ার রুই-মেছো টিকিট।

কথাটা প্রকাশ করবার কান্তির আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু টার্ফ ক্লাবে অফিসের ঠিকানা দেওয়া ছিল ব'লে কথাটা দিন দুয়েকের মধ্যেই রাষ্ট্র হয়ে গেল। তখনকার দিনে সারা পৃথিবী ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের ডার্বির টিকিট কিনত ব'লে প্রথম পুরস্কার চল্লিশ লক্ষ টাকা ছুঁই-ছুঁই করত। কান্তির টিকিটের ঘোড়া 'সোরিং ঈগল' এত নামজাদা ঘোড়া যে, দৌড়ে সে যদি প্রথম স্থান অধিকার করে তা হ'লে বিস্ময়ের কিছুই হবে না।

একজন ফিরিঙ্গী অফিসে এসে কান্তিকে খুঁজে বার ক'রে কোনো এক ইউরোপীয় ক্লাবের পক্ষ থেকে কান্তির টিকিট ক্রয় করবার প্রস্তাব করলে। সমস্ত টিকিটটা কান্তি যদি বিক্রয় করে তা হ'লে বিশ হাজার টাকা; আর, অর্ধেক বিক্রয় করলে আট হাজার।

মাথা নেড়ে কান্তি বললে, "না, ধন্যবাদ।"

ফিরিঙ্গী দালাল বললে, "শুনুন। পুরো টিকিটের জন্যে আপনাকে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত পাইয়ে দিতে পারি, কিন্তু তা হ'লে আমাকে টু-হাফ পারসেণ্ট কমিশন দিতে হবে।"

কান্তি বললে, "না, ধন্যবাদ।"

ভজাবার জন্য কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা ক'রে অবশেষে দালাল বললে, "আমার প্রস্তাবের কথা বাড়ি গিয়ে ভাল ক'রে ভেবে দেখবেন।...কাল আসব ?"

"আজ্ঞে না। তাতে আপনার আর আমার দুজনেরই সময় নষ্ট হবে।"

পকেট থেকে একটা কার্ড বার ক'রে কান্তির সামনে রেখে দালাল বললে, "দরকার মনে করলে আমাকে জানাবেন।"

কার্ডখানা দালালকে ফিরিয়ে দিয়ে কান্তি বললে, "এ আমার কোনো দরকারেই লাগবে না। আপনার দরকারে লাগবে।"

অফিসে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটে নি। বিশেষত দালালকে প্রত্যাখ্যান করার পর ব্যাপারটা প্রগাঢ় হয়ে উঠল। কান্তির বড়বাবু কান্তিকে বললে, "কাজটা ভাল করলে না কান্তি। শাস্ত্র বলেছেন, ধ্রুবকে পরিত্যাগ ক'রে যে অধ্রুবর সেবা করে, ধ্রুব তো গেলই—অধ্রুবও যাবার দাখিল।"

কান্তি বললে, "বড়বাবু, ধ্রুব তো ত্রিশ হাজার টাকা, যার অভাবে আমার বেশ চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু অধ্রুব ত্রিশ লক্ষ টাকা। এ অধ্রুবের জন্যে ত্রিশ হাজার টাকা রিস্ক্ করা উচিত। No risk, no gain."

"তুমি কি ফার্স্ট প্রাইজ পাবে ঠিক করেছ ?"

"ঠিক করি নি, হিসেব করেছি। যেখানে ফার্স্ট প্রাইজ আর সেকেণ্ড প্রাইজ দুইই অধ্রুব, সেখানে ফার্স্ট প্রাইজের হিসেব করাই উচিত।"

এ যুক্তির পর বড়বাবু আর কথা খুঁজে পায় নি।

কান্তির টিকিট অথবা টিকিটের অংশ কেনবার জন্যে কয়েকদিন ধ'রে

নানা জাতির নানা লোক যাতায়াত করলে। কান্তির কিন্তু সকলেরই প্রতি একই দৃঢ় উত্তর, না।

অবশেষে একদিন স্বয়ং বড় সাহেব ড্রেক্‌ব্রক্‌ম্যান পর্যন্ত ওই প্রস্তাবই করলে; বললে, "আমার একটি পরিচিত লোক পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তোমার টিকিটের অর্ধাংশ কিনতে ইচ্ছুক আছেন। আমার তো মনে হয় ক্যান্টি, এ প্রস্তাব তোমার রাজী হবার উপযুক্ত।"

জোড় হস্ত ক'রে কান্তি বললে, "প্রস্তাব অতিশয় উত্তম, সন্দেহ নেই। কিন্তু স্যার, আমি একটু অন্য হিসেবের মানুষ। আমার ঘোড়া non-starter হ'য়ে আমি যদি মাত্র হাজার তিন-চার টাকা পাই, আমি সেটা এ খেলার একটা প্রত্যাশিত পরিণতি ব'লেই মনে করব। কিন্তু উপস্থিত পঞ্চাশ হাজার টাকা নেওয়ার ফলে পরে যদি দেখা যায় আমি পনেরো লক্ষ টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তা হ'লে সেটা নিজের কৃতকর্মের ফল ব'লে আঘাত পাব। অদৃষ্টে যে দোর খুলেছে আমি তার আধখানা নিজ হাতে বন্ধ ক'রে দিতে চাই নে।"

ড্রেক্‌ব্রক্‌ম্যান বললে, "ঠিক আছে ক্যান্টি, তুমি ফার্স্ট প্রাইজ লাভ কর, এ আমি একান্ত মনে কামনা করি।"

৩

ড্রেক্‌ব্রক্‌ম্যানের কামনা কিন্তু ষোল আনা পূর্ণ হ'ল না। সোরিং ঈগল প্রথম স্থান অধিকার করতে পারলে না। দ্বিতীয় স্থানও না; অধিকার করলে তৃতীয় স্থান।

তৃতীয় পুরস্কারের তায়দাদও অবশ্য কম নয়, প্রায় ন' লক্ষ টাকা। প্রথম পুরস্কার না পাওয়ার নৈরাশ্য, অথবা নন-স্টার্টারের গহ্বর থেকে

পরিত্রাণ লাভের উল্লাস, উভয়েরই দ্বারা অবিচলিত কান্তিভূষণ এই বিপুল সৌভাগ্যকে গীতোক্ত অস্পৃহতার সঙ্গে গ্রহণ করলে।

যেদিন কান্তি শুভ সংবাদ পেলে সেদিন অফিসের ছুটি। সেভিংস্ ব্যাঙ্ক থেকে শ দুয়েক টাকা তুলে সে কাথ্‌বার্টসন্ হার্পারের দোকানে গিয়ে পেটেণ্ট লেদারের মূল্যবান পাম্প-শূ খরিদ করলে। তারপর বহু দোকান ঘুরে ঘুরে ক্রয় করলে শান্তিপুরী ও ঢাকাই ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, মূল্যবান গেঞ্জি ও রুমাল, পিয়ার্স সাবান, অ্যাট্‌কিন্‌স্ ট্রিপল এক্সট্র্যাক্ট হোয়াইট্ রোজ্, পমেটম, আরও কত কি!

পরদিন প্রাতে নামজাদা সেলুনে গিয়ে দাড়ি গোঁফ একেবারে মসৃণ ক'রে চাঁচিয়ে ফেললে, চুল ছাঁটালে একেবারে তেরো-আনা-তিন-আনা হিসাবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নূতন সাজগোজ ক'রে অফিস যেতে এই প্রথম বিলম্ব হয়ে গেল আধ ঘণ্টাটাক।

অ্যাট্‌কিন্‌সন্স হোয়াইট রোজের সুমিষ্ট সৌরভ বিকীর্ণ ক'রে কান্তি যখন অফিস-ঘরে প্রবেশ করলে তখনো বাবুদের মধ্যে তার অভাবিত সৌভাগ্য সংক্রান্ত আলোচনা একেবারে শেষ হয় নি। এক মুহূর্ত কাটল উৎকট বিস্ময়ে; তারপর উঠল অবারিত উল্লাসের বিপুল হর্ষধ্বনি। সাধু কান্তি রাতারাতি একেবারে জামাইবাবু ব'নে গেছে!

বড়বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে কান্তি বললে, "বড়বাবু, নমস্কার।"

বড়বাবু বললে, "নমস্কার। কিন্তু তুমি আমাদের সেই কান্তিই বটে তো?"

বিনীত কণ্ঠে কান্তি বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ বড়বাবু, আমি আপনাদের সেই কান্তিই বটে।"

কান্তির ওষ্ঠাধরে এক অপূর্ব পাতলা রসিকজনোচিত হাসি, যা ইতিপূর্বে কোনোদিন দেখা যায় নি। হয় এ হাসি তৃতীয় প্রাইজের

গর্ভ হতে একেবারে সদ্যোদ্ভূত বস্তু, নয় গুম্ফশ্মশ্রুর ঘন অরণ্যের মধ্যে এতদিন আত্মগোপন ক'রে ছিল।

বড়বাবুকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে কান্তি বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

হোমিওপ্যাথ কানাই দে বললে, "কান্তি মনোম্যানিয়ার স্টেজ পেরিয়েছে।"

বড় সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ সেলাম ক'রে কান্তি যুক্তকরে দাঁড়াল।

দক্ষিণ হাত দিয়ে সেই যুক্তকর চেপে ধ'রে সজোরে নাড়া দিয়ে ড্রেক্‌ব্রক্‌ম্যান বললে, "আমি তোমাকে অন্তরের সঙ্গে অভিনন্দিত করছি ক্যান্টি। তোমার সৌভাগ্যে আমরা সকলেই অতিশয় আনন্দিত।"

দু-চারটে কথাবার্তার পর বড় সাহেব বললে, "যেমন করছ, তুমি নিশ্চয় আমাদের অফিসে তেমনি কাজ করবে?"

হাত জোড় ক'রে কান্তি বললে, "আর কেন স্যার! আমার জায়গায় আর একজন প্রোভাইডেড হতে পারবে। আমি আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। যে দয়া স্নেহ আপনার কাছে পেয়েছি তা কোনোদিন ভুলতে পারব না।"

কান্তি কর্মনিষ্ঠ পরিশ্রমী বুদ্ধিমান কর্মচারী, তাকে ছাড়তে বড় সাহেবের মন চাচ্ছিল না। কিন্তু বিপুল অর্থের অধীশ্বরকে কি ক'রেই বা দশটা-পাঁচটা কেরানীগিরির কঠিন আসনে বসিয়ে রাখা যায়?

বড় সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে অন্য সাহেবদের সঙ্গে দেখা ক'রে গৃহ থেকে লিখে-আনা রেজিগ্‌নেশন-লেটার বড়বাবুর কাছে দাখিল ক'রে কান্তি গৃহে ফিরল।

* * *

ন লক্ষ টাকার তাল একা সামলানো কঠিন হবে, সে বুদ্ধি কান্তির ছিল। কলিকাতার এক নামজাদা অ্যাটর্নি-অফিসের একজন পার্টনার ছিল তার বাল্যবন্ধু। তার নাম শরৎকুমার সেন। শরতের সঙ্গে অফিসে দেখা ক'রে কান্তি নিম্নপ্রকার ব্যবস্থা করলে। কান্তির নিকট থেকে আমমোক্তারনামা নিয়ে অ্যাটর্নি ফার্ম ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব থেকে টাকাটা আদায় ক'রে বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কে জমা দেবে; তারপর টাকাটা নিম্নলিখিতভাবে ব্যয় করবে: এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা নেবে কান্তি নিজে; পারিশ্রমিক বাবদ অ্যাটর্নি ফার্ম পাবে পাঁচ হাজার টাকা; আর বাকি টাকাটা কান্তির নির্দেশমতো বাংলা দেশের কয়েকটি জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে ভাগ ক'রে দিতে হবে।

কান্তি বললে, "যে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে, টার্ফ ক্লাবের ড্রাফ্‌ট্‌ ব্যাঙ্কে জমা হওয়ার পর যেমন যেমন আমি চাইব পাঁচ হাজার টাকার কিস্তিতে এক শো টাকা থেকে পাঁচ টাকার পর্যন্ত নোটে দিয়ে যাবেন।"

কাজটা জটিল নয়, আর অল্পদিনের মধ্যে শেষ হবার উপযুক্ত; সুতরাং শরৎকুমারের সুপারিশে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিকে অ্যাটর্নি ফার্ম এ কাজের ভার নিতে স্বীকৃত হ'ল।

৪

মাসখানেক পরের কথা।

বেলা তখন চারটে। কান্তিকে চা খাইয়ে গোকুল বাজারে গিয়েছে। মোটা বেতনে সে এখন দিন-রাত্রির চাকর। একজন ঠিকা পাচকও আছে। সে দু বেলা রান্না ক'রে খাইয়ে যায়।

সদর-দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠল।

হুড়কো খুলে কান্তি দেখলে, দীর্ঘাকার এক দারোয়ান দাঁড়িয়ে। তার খাকি রঙের কোটের বাম বুকের ওপর চকচক্ করছে দুটি রূপালি অক্ষর: M. S.। বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে স্ট্র্যাপে ঝুলছে চামড়ার ব্যাগ।

কান্তিকে দেখে নত হয়ে অভিবাদন ক'রে দারোয়ান বললে, "মুখার্জি-সেন থেকে আসছি।"

কান্তি বললে, "টাকা এনেছ?"

"জী হুজুর।"

"পাঁচ হাজার টাকা?"

"জী হুজুর।"

"আচ্ছা, ভেতরে এস।"

দারোয়ান ভিতরে এলে কান্তি হুড়কো লাগিয়ে দিলে।

কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপ নামিয়ে ব্যাগ খুলে দারোয়ান পাঁচ হাজার টাকার নোট কান্তিকে বুঝিয়ে দিয়ে রসিদ নিয়ে চ'লে গেল।

দোর লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে নোটের তাড়াগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখে কান্তি সেগুলোকে আলমারির বইয়ের সারের পিছনে রেখে দিলে।

যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে সে শুয়ে পড়ল। প্রথমে একচোট অল্প-একটু ঘুম হ'ল; কিন্তু তার পর আর ভাল ঘুম হয় না—থেকে থেকে চটকা ভেঙে যায়, জানলার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে কি-না! নিদ্রা-জাগরণের তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে মাঝে মাঝে মনে পড়ে রামকৃষ্ণদেবের কথা—টাকা মাটি মাটি টাকা। ঠিক বুঝতে পারে না, এ কথা সে মুখে আওড়াচ্ছে, অথবা মনে?

মনে হয়, আলমারির ভিতর সাদা সাদা নোটগুলোর পাখা গজিয়েছে,

দোর খুলে দিলেই তারা উড়ে যায়।···কি মজা! এর গায়ে ওর গায়ে গিয়ে বসবে, আর চমকে চমকে উঠে লোকে ভাববে—এ আবার কি পাখি রে বাবা! জাল নয় তো?

শেষের দিকে কান্তি খানিকটা ঘুমিয়ে পড়ল। উঠতে একটু দেরি হয়েই গেল। তাড়াতাড়ি সকালের কাজকর্ম সেরে নিয়ে সে বার হবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। ফরমাস দিয়ে সে ফতুয়া করিয়েছিল। তার ওপর দিকে তিনটে পকেট, ভিতর দিকে থলের মত দুটো। ফতুয়াটা গায়ে চড়িয়ে পকেটগুলো বিভিন্ন মূল্যের নোটে ভরিয়ে নিয়ে তার উপর পাঞ্জাবি প'রে সে বেরিয়ে পড়ল।

সদর-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান্তি চলনশীল পথিকদের নিরীক্ষণ করতে লাগল। একটি লোক গঙ্গাস্নান সেরে গৃহে ফিরছিল, কান্তি ডেকে বললে, "ও মশায়, শুনুন।"

লোকটি কাছে এসে বললে, "কি বলুন?"

"গঙ্গাস্নান ক'রে ভারি সাত্ত্বিক চেহারা বাগিয়ে চলেছেন তো!" পকেট থেকে একশো টাকার নোট বার ক'রে লোকটির হাতে দিয়ে কান্তি বললে, "এটা রাখুন।"

নোটখানা ভাল ক'রে দেখে লোকটি বললে, "ছেলেদের খেলবার নোট বুঝি?"

"না, খেলবার নোট নয়, আসল নোট; দোকানে সওদা করলে জিনিস পাবেন।"

"এর জন্যে দিতে হবে নাকি কিছু?"

"দিতে হ'লে একশো টাকা দিতে হয়। কিছু দিতে হবে না।"

বাদানুবাদ করার চেয়ে বিনা পয়সার জাল জিনিসও নিয়ে স'রে পড়া ভাল বিবেচনা ক'রে লোকটি দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোকরা জমা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে বললে, "আমাকে একখানা দিন না মশায়!"

হাসিমুখে কান্তি বললে, "এ জিনিস চেয়ে পাওয়া যায় না বাবা; ভাগ্যে থাকলে জোটে।" ব'লে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগল। দু-চার পা এগিয়ে হাঁক দিলে, "এই ঝাঁকা!"

সামনে একটা ঝাঁকা মুটে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কিয়া বাবু?"

কান্তি বললে, "আরে বাবা! খানে বিনা তো ভুখমে মরতে হো। এত্তা বড়া ভুঁড়ি বাগায়া কৈ সে?" ব'লে তার ভুঁড়িতে একটা চিমটি কেটে হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিলে।

চিমটি কাটার জন্য আপত্তি করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাতে নোট পেয়ে লোকটা সামলে গেল। বললে, "ইয়া কিয়া হোগা?"

"তোমারা ভুঁড়িকা সেবা হোগা।"

"ঈ চলেগা বাবু?"

"খালি চলেগা নহি, দৌড়েগা।"

খানিকটা এগিয়ে কান্তি একটা লোককে বললে, "ওহে, তুমি তো বেশ তড়াক ক'রে জলটা ডিঙিয়ে গেলে! এই ধর, দশ টাকার নোট।"

তারপর কাউকে তার কণ্ঠস্বরের জন্য পঞ্চাশ টাকার নোট (তখনকার দিনে পঞ্চাশ টাকার নোটের চলতি ছিল), কাউকে তার নাসিকার বক্রতার জন্য পাঁচ টাকার নোট, কাউকে তার গতিভঙ্গীর জন্য এক শত টাকার নোট দিতে দিতে সে এগিয়ে চলল।

যে জনতা এতক্ষণ কান্তিকে অনুসরণ করছিল, তারা উপলব্ধি করলে পিছন দিকে থেকে লাভের উপায় নেই; কান্তির দৃষ্টিপথে থাকবার জন্যে তারা কান্তির সম্মুখে এসে পিছন হাঁটতে লাগল।

এইরূপে দু-হাতি নোট বিতরণ করতে করতে এবং সম্মুখে এক পশ্চাদ্‌গামিনী জনতার বিরাট বাহিনী বহন ক'রে কান্তি যখন গ্রে স্ট্রীট কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ে উপস্থিত হ'ল, বেলা তখন সাড়ে দশটা। মোড়ে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক নোট বিতরণ ক'রে কান্তি গৃহে প্রত্যাগমন করলে। প্রত্যাগমন-পথের কাহিনীও ঠিক একই রকম। বেলা বারোটার সময়ে কান্তি যখন গৃহে প্রবেশ করলে, তখন পাঁচটি পকেটের পাঁচটিই রিক্ত।

দ্বিতীয় দিন প্রায় একই ভাবে গেল। তৃতীয় দিন থেকে ব্যাপারটা কিন্তু গুরুতর আকার ধারণ করলে। সকাল তখন সাড়ে চারটে হবে, সবেমাত্র কাক কোকিল ডাকতে আরম্ভ করেছে; দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে দ্বার খুলে কান্তি বললে, "কি রে গোকুল?"

নিম্নকণ্ঠে গোকুল বললে, "বাবু, আমাদের বাড়ির সামনে বোধ হয় পাঁচ শো লোক জড় হয়েছে!"

"বলিস কি রে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হবে।"

ছটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে পাঁচটা পকেট নোটে ভর্তি ক'রে নিয়ে কান্তি বেরিয়ে পড়ল। তাকে দেখে বিশাল জনতা বিপুলভাবে উল্লাস-ধ্বনি ক'রে উঠল। তারপর কেউ হাসতে লাগল, কেউ কাঁদতে লাগল, কেউ গান গাইতে লাগল, কেউ মুখ 'ও' ক'রে রইল, কেউ 'ঈ' ক'রে রইল, কেউ ডিগবাজি খেতে লাগল, কেউ বা পা উঁচু মাথা নীচু ক'রে হাতে হাঁটতে লাগল; আর এই জটিল ও বিপুল জনতাকে পুরোবর্তী ক'রে দক্ষিণে ও বামে নোট বিতরণ করতে করতে কান্তিভূষণ ধীর মন্থর গতিভরে এগিয়ে চলল। শোভাযাত্রা যখন সারকুলার রোড কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছল তখন জনতা স্ফীত হয়ে অন্তত

হাজার পাঁচেকে দাঁড়িয়েছে। যান চলাচল গেল বন্ধ হয়ে, লুঠতরাজের ভয়ে অনেকে দোকানপাট বন্ধ ক'রে ফেললে, পঞ্চ সহস্র কণ্ঠের উল্লসিত জয়ধ্বনি শুনে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনকে পা উঁচু ক'রে হাতে হাঁটতে দেখে ট্রামের দুই ঘোড়া ক্ষেপে উঠে লোহার শিকল ছিঁড়ে ফেলে লাইন ছেড়ে পাশের দিকে স'রে গেল।

দশজন কনস্টেবল নিয়ে একজন ইন্সপেক্টার মব কন্ট্রোল (mob control) করছিল। ইন্সপেক্টার এসে কান্তিকে চোখ রাঙিয়ে বললে, "বন্ধ করুন এ সব।"

ধীরভাবে কান্তি বললে, "কি বন্ধ করব? এই দান?...তার চেয়ে আপনি বন্ধ করুন না দানের চেয়ে মন্দ জিনিস জনতার এই উচ্ছৃঙ্খলতা।"

কঠোর স্বরে ইন্সপেক্টার বললে, "এ রকম পথে পথে নোট ছড়িয়ে বেড়ানো অবৈধ।"

কান্তি বললে, "কালও আসব। কাল যদি দেখাতে পারেন আমার আচরণ আইন-কানুনের বিরুদ্ধ, নিশ্চয়ই বন্ধ করব।"

দিনের পর দিন চলল এই নোট-বিতরণের খেলা—নোট-কাগজ কাগজ-নোটের লীলা। কল খোলা আছে, বেলা চারটে আন্দাজ মুখার্জি-সেনের অফিস থেকে অর্থস্রোত পাইপ ব'য়ে আসে, পরদিন শত শত লোকের হাতে তা ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু সব জিনিসের শেষ আছে; এক লক্ষ ষাট হাজার টাকারও। মাস দেড়েক পরে অ্যাটর্নির বাড়ির কল বন্ধ হ'ল। একটা কাগজে বড় বড় অক্ষরে কান্তি লিখলে: নোট ফুরিয়েছে, বাড়ি যাও। তারপর সেটা পেস্টবোর্ডে আটা দিয়ে এঁটে পথের ধারে সদর-দরজার মাথায় লটকে দিলে। মৌমাছির দল দু-চারদিন সকালবেলায় ভনভন করলে; তারপর বুঝতে পারলে, সত্যিই মধু ফুরিয়েছে।

সকাল সকাল আহারাদি সেরে গলাবন্ধ কোট, কোঁচাতোলা ধুতি ও নাগরা জুতা প'রে কান্তিভূষণ অফিসে উপস্থিত হ'ল। বড় সাহেবের ঘরের বারান্দায় উপস্থিত হয়ে চাপরাসীকে দিয়ে শ্লিপ পাঠিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল।

ঘরে প্রবেশ ক'রে কান্তি দীর্ঘ সেলাম ক'রে দাঁড়াল।

সহাস্য মুখে ড্রেক্‌ব্রক্‌ম্যান বললে, "কি খবর ক্যান্টি?"

কান্তি বললে, "আমার আর কিছু নেই স্যার। বাইরের উৎপাত বাইরেই বেরিয়ে গেছে।"

"ন লক্ষ টাকাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ন লক্ষ টাকাই। যত টাকা তত worry স্যার। না থাকলেই শান্তি।"

ড্রেক্‌ব্রক্‌ম্যান হাসতে লাগল; বললে, "এ হিসেব করতে পারলে তো আর কোনো কথাই বলবার থাকে না।"

আরও দু-চারটে কথার পর কান্তি মাথা চুলকাতে লাগল।

"কিছু বলবে ক্যান্টি?"

"যদি স্যার সম্ভব হয়—"

"চাকরি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমার আসন তোমার জন্যে খালিই আছে। খবরের কাগজে যখন তোমার নোটবিতরণের কাহিনী পড়তে লাগলাম, তখনই বুঝেছিলাম, তুমি একদিন ফিরে আসবে। আমি বড়বাবুকে লিখে দিচ্ছি,—আজ থেকেই তুমি কাজে ব'সে যাও।"

বিনীত প্রসন্নকণ্ঠে কান্তি বললে, "কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নে স্যার।"

বড় সাহেবের নোট নিয়ে কান্তি তার অফিস-কক্ষে উপস্থিত হ'লে তাকে দেখে সকলেই খুশী হ'ল। বড় সাহেবের নোট প'ড়ে বড়বাবু বললে, "তুমি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এলে, এ খুবই আনন্দের কথা কান্তি।"

মৃদু হেসে কান্তি বললে, "যা হারিয়েছিলাম তা পেয়ে আমিও খুব সুখী হয়েছি বড়বাবু।"

কান্তি তার পরিত্যক্ত চেয়ারে গিয়ে বসল।

কানাই দে চুপি চুপি তার পাশের সহকর্মীকে বললে, "কান্তির মুখে হাসির পরিবর্তন লক্ষ্য করছ? আর, আবার গোঁফ-দাড়ি গজাতে আরম্ভ করেছে? এ ইন্‌স্যানিটি আরোগ্য হবার অবস্থা। দু ডোজ ষ্ট্র্যামোনিয়ম ২০০ খেলে একেবারে পাকা ভাবে সেরে যায়।"

বড়বাবুর কাছ থেকে একটা ফাইল পেয়ে তখন কান্তি অতি প্রসন্ন মনে ঘাড় গুঁজে কাজ করছে।

আশ্বিন ১৩৬০

নতুন লেখক

১

সম্প্রতি বাংলা দেশে ধূমকেতু নামে একটি মাসিকপত্রের আবির্ভাব হয়েছে। আবির্ভাবটা হয়েছেও ঠিক আকাশের ধূমকেতুরই মতো। অকস্মাৎ একদিন, প্রায় বিনা নোটিসেই, বাংলা মাসিকপত্র-গগনের একটা দিক উজ্জ্বল ক'রে ধূমকেতুর আবির্ভাব হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে সে আকাশের চন্দ্র-তারা মাসিকপত্রগুলো নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

সম্পাদক ডক্টর সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটা ডিগ্রী সম্মানের সহিত অধিকার ক'রে সাত বৎসর ইউরোপে বাসের ফলে নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হয়ে সে দেশে ফিরেছে। কিন্তু শুধু সুপণ্ডিত হয়েই ফেরে নি, পাণ্ডিত্যের চেয়েও দুর্লভ বস্তু, নির্ভুল তীক্ষ্ণ সাহিত্যবোধ আর তীব্র সাহিত্যপ্রীতি নিয়ে ফিরেছে।

ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবেদনে সমরেশ লিখেছিল, হিন্দুশাস্ত্র মতে ধূমকেতু অশুভ গ্রহ; কিন্তু অশুভকে বাদ দিয়ে জগৎ চলে না, আমাদের জীবনও চলে না। অশুভ হ'লেও ধূমকেতু তামস নয়, জ্যোতিষ্মান্। তা ছাড়া, ধূমকেতুর ন্যায় অকস্মাৎ একদিন আবির্ভূত হয়ে ধূমকেতু এক দিক দিয়ে তার নাম কতকটা সার্থক করেছে, আবার ভবিষ্যতে কোনো একদিন সে যদি অকস্মাৎ দৃষ্টিপথের অন্তরালে চ'লে যায়, সে দিনও তার নাম অসার্থক হবে না।

সমরেশ নিষ্ঠাবান কড়া সম্পাদক। প্রত্যেক লেখাটি সে নিজে পড়ে, আর 'ক' 'খ' 'গ' তিন শ্রেণীতে লেখাগুলি চিহ্নিত করে। 'ক'-চিহ্নিত

লেখা ফেরত যাবে না, সময়মতো ধূমকেতুতে প্রকাশিত হবে; ‘খ’-চিহ্নিত লেখা ফেরত যাবে, কিন্তু অপর পত্রে ব্যবহৃত হতে পারে; ‘গ’-চিহ্নিত লেখা অব্যবহার্য পদার্থ, রদ্দি মাল।

সমরেশের এই শ্রেণী বিভাগের কথা, যে-রকম ক’রেই হোক, বাজারে প্রচারিত হয়ে গেছে। ‘খ’-চিহ্নিত করার মধ্যে যে ঔদ্ধত্য নিহিত আছে, সে জন্য অপর পত্রের সম্পাদকেরা তার ওপর বিশেষ খাপ্পা। কোনো লেখাকে সমরেশ ‘খ’-চিহ্নিত করেছে জানতে পারলে তারা কিছুতেই সে লেখা নিজেদের কাগজে প্রকাশিত ক’রে ধূমকেতুর নিম্নবর্তী হতে চায় না।

২

অন্য স্থানে স্বতন্ত্র কার্যালয় থাকলেও, সমরেশের গৃহে একতলার এক কক্ষে একটি ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় অফিস আছে। লোকের ভয়ে সাধারণত সমরেশ একতলার ঘরে ব’সে কাজ করে না, দোতলাতেই করে। যে এসে একবার বসে, সে তো সহজে ওঠবার নাম করে না; সুতরাং দু ঘণ্টা একতলার ঘরে বসলে তার দেড় ঘণ্টাই বোধ হয় বৃথাই অপচয়িত হয়।

একদিন সকাল ন’টা আন্দাজ সে নীচের ঘরে একটা পাণ্ডুলিপি নিতে এসেছে, এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করল এক যুবক, দক্ষিণ হস্তে খবরের কাগজে মোড়া সম্ভবতঃ পাণ্ডুলিপি। আয়তন ভীতিপ্রদ নয়।

সমরেশকে যুক্তকরে নমস্কার ক’রে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি কি—”

কথা শেষ হতে না দিয়ে সমরেশ বললে, “আজ্ঞে হ্যাঁ, সম্পাদক।”

"একটা লেখা এনেছিলাম।"

"রেখে যান। কি পদার্থ ওতে আছে?"

স্মিতমুখে যুবক বললে, "উপন্যাস।"

"আপনার নিজের লেখা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি নাম আপনার?"

"সুধাকর চট্টোপাধ্যায়।"

"প্রথম উদ্যম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"রেখে যান। দিন দশেক পরে খবর নেবেন।"

পাণ্ডুলিপিখানা টেবিলের উপর স্থাপন ক'রে ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে সুধাকর বললে, "একটা কথা বলব সম্পাদক মশায়?"

ঈষৎ গম্ভীর স্বরে সমরেশ বললে, "সংক্ষেপে যদি বলেন, আপত্তি নেই।"

সুধাকর বললে, "সংক্ষেপেই বলব। বাজারে আপনার একটু দুর্নাম আছে ডক্টর ব্যানার্জি।"

সমরেশ বললে, "লোক যখন অসৎ তখন দুর্নাম থাকা আশ্চর্য নয়;—তবু কি দুর্নাম শুনি?"

সুধাকর বললে, "অসৎ লোকের দুর্নাম আপনার নয়; আপনার দুর্নাম খ্যাতনামা লেখক ভিন্ন আর কারো লেখা আপনি প্রকাশ করেন না।"

সমরেশ বললে, "তার জন্যে দুর্নাম অখ্যাত লেখকদেরই হওয়া উচিত। তারা যদি প্রকাশ করবার উপযুক্ত লেখা লিখতে না পারে, তার জন্যে আমার দুর্নাম কি ক'রে হয়, তা বলুন?"

এ তর্কে প্রবৃত্ত না হয়ে সুধাকর বললে, "আমার লেখা আপনি সবটা পড়বেন তো ডক্টর ব্যানার্জি ?"

সমরেশ বললে, "সবটা পড়বার মতো যদি লিখে থাকেন তা হ'লে সবটা অবশ্যই পড়ব। কিন্তু পাতা দুই পড়বার পর যদি বুঝতে পারি বাকি অংশে অসম্ভব ঘটবার কোনও সম্ভাবনা নেই, তা হ'লে সবটা পড়ার কোনো মানে থাকবে কি ?…কিন্তু এ প্রশ্ন আপনার মনে উদয় হ'ল কেন ?"

সুধাকর বললে, "প্রথমত, আমার নাম জিজ্ঞাসা ক'রে দেখলেন কোনো বিখ্যাত নাম নয় ; দ্বিতীয়ত, এইটে যে আমার প্রথম উদ্যম, সে কথাও জেনে নিলেন। এই দুই কারণে ও-প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছিল।"

যে পাণ্ডুলিপিখানা নিতে এসেছিল সেটা, আর সুধাকরের পাণ্ডুলিপি —দুখানা পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সমরেশ বললে, "এর পরও যদি আমরা আলোচনা চালাই তা হ'লে সংক্ষেপের সীমা নিশ্চয়ই পেরিয়ে যাবে।"

"তা নিশ্চয় যাবে।" ব'লে সমরেশকে নমস্কার ক'রে সুধাকর প্রস্থান করলে।

৩

দিন দশেক পরে খবর নেওয়ার কথা ছিল, ঘটনাক্রমে ঠিক দশম দিনে সুধাকরকে ধূমকেতু অফিসের কাছাকাছি আসতে হয়েছিল। হিসাব-মতো 'দিন দশেক পরে' তখনো ঠিক হয় নি। কিন্তু 'দিন দশেক' আর 'দশ দিন' একেবারে এক বস্তু নয়। ন' দিনকে দিন দশেক বললে খুব বেশী অন্যায় করা হয় না।

মনে মনে এইরূপ যুক্তি ক'রে সুধাকর ধূমকেতু অফিসের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল। দ্বার খোলাই ছিল, অফিস-ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখলে, কেউ নেই। টেবিলের উপর কলিং বেল ছিল, বেল বাজিয়ে শব্দ করলে।

একটি বিশ-বাইশ বৎসর বয়সের যুবক এসে উপস্থিত হ'ল।

সুধাকর বললে, "ডক্টর ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার একটা লেখা তাঁর কাছে আছে।"

যুবকটি বললে, "কিন্তু তিনি তো এখন বাড়ি নেই। অন্য কোনদিন আসবেন।"

"কখন ফিরবেন, তা কিছু বলতে পারেন?"

"না, তার কোন স্থিরতা নেই। বৈকালের দিকে অফিসে গেলে দেখা হতে পারবে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুধাকর বললে, "আপনার নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

যুবকটি বললে, "আমার নাম অমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"সম্পাদক মহাশয়ের পুত্র?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"অফিসে যাওয়ার সুবিধা হবে না, দিন তিনেক পরে আবার একদিন আসব।" ব'লে যুক্তকরে অমরেশকে নমস্কার ক'রে সুধাকর প্রস্থান করলে।

পথে পদার্পণ ক'রেই কিন্তু ক্রোধে তার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্ব'লে উঠল। ডক্টর ব্যানার্জি বাড়ি নেই ব'লে অমরেশ তাকে তাড়ালে, অথচ দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং ডক্টর ব্যানার্জি পথের একজন লোকের সঙ্গে কথা কইছে! শিক্ষিত লোক হয়ে এই ঘৃণিত প্রতারণা, এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারিতা!

একবার মনে হ'ল, ফিরে গিয়ে অমরেশকে ডাকিয়ে এনে আচ্ছা ক'রে একটা ঝগড়া বাধিয়ে আসে; কিন্তু এরূপ উত্তেজনার মুহূর্তে মাত্রা হয়তো ঠিক বশীভূত থাকতে পারবে না সেই বিবেচনায় গৃহের দিকে অগ্রসর হ'ল।

কতকটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আলগা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে একবার মাত্র সে দোতলার জানলার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। অপরিসীম ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে আর দ্বিতীয়বার সে-দিকে দৃষ্টিপাত করলে না,—নমস্কার অথবা অপর কোনপ্রকার অভিবাদন ইঙ্গিত তো দূরের কথা।

ধূমকেতুতে সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নবীন লেখকদের লেখা প্রকাশিত করে না, তজ্জনিত সুধাকরের মনের মধ্যে যে বিদ্বেষ-ইন্ধন বর্তমান ছিল, তার উপর নূতন ক্রোধের স্ফুলিঙ্গপাত হয়ে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলতে জ্বলতে সুধাকর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

৪

দিন তিনেক পরে একদিন আসবে ব'লে সুধাকর অমরেশকে জানিয়ে এসেছিল; কিন্তু তিন দিন অপেক্ষা করবার ধৈর্য সে খুঁজে পেলে না। পরদিন সকালেই যুযুৎসু মন নিয়ে সমরেশের গৃহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

সম্পাদকের কক্ষ পর্যন্ত পথ অবারিত ছিল। অফিস-ঘরে প্রবেশ ক'রে সুধাকর থমকে গেল। যে সৈনিকের সঙ্গে তাকে প্রথমে যুদ্ধ করতে হবে, তার অস্ত্র-শস্ত্র একেবারে স্বতন্ত্র ধরণের; তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার রণকৌশলে সে ঠিক অভ্যস্ত নয়। মাথায় তার একরাশ ভ্রমরকৃষ্ণ শিরস্ত্রাণ।

তথাপি নিজের সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে নিয়ে ঈষৎ গম্ভীর স্বরে সে বললে, "নমস্কার।"

সম্পাদকের টেবিলের সামনে ব'সে সতের-আঠার বৎসর বয়সের একটি সুশ্রী সুন্দরী মেয়ে কয়েকখানা চিঠি লিখছিল, মুখ তুলে চেয়ে দেখে বললে, "নমস্কার। বসুন।"

চেয়ারে উপবেশন ক'রে সুধাকর জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি ধূমকেতুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ?"

পিন দিয়ে দুটো কাগজ আঁটতে আঁটতে মেয়েটি বললে "একটু।"

"আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ?"

"আমার নাম অমিয়া বন্দোপাধ্যায়; আমি ডক্টর ব্যানার্জির কন্যা।" তারপর একটা কাগজ-চাপা দিয়ে পিনে আঁটা কাগজ দুটো চেপে রেখে সুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সে প্রশ্ন করলে, "কি চাই আপনার ?"

"একটা অকপট সংবাদ।"

"কি বলুন ?"

"ডক্টর ব্যানার্জি বাড়ি আছেন কি না, সেই সংবাদ।"

"আছেন।"

"আছেন ? পরম সৌভাগ্য আমার !"

ডক্টর ব্যানার্জিকে বাড়িতে পাওয়া যার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা, এমন লোক থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু তেমন লোকের কথার সুর আলাদা, বলার তাল অন্যরূপ। সুধকারের কথার মধ্যে যেন টিটকারির সূক্ষ্ম গিটকিরি। সেটুকু উপলব্ধি করতে অমিয়ারও ভুল হ'ল না; চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে সে বলল, "পরম সৌভাগ্য কেন বলুন তো ?"

সুধাকর বললে, "বাড়িতে থেকেও তিনি কোনো কোনো দিন থাকেন না কি-না, তাই বলছি।"

"এমন অভিজ্ঞতা আপনার আছে ?"

"নিশ্চয়ই আছে। কাল সকালে এসেছিলাম ডক্টর ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে, অমরেশ বাবু বললেন, তিনি বাড়ি নেই। পর-মুহূর্তে পথে বেরিয়ে দেখি, পথের একজন লোকের সঙ্গে আপনার বাবা দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছেন। ভাগ্যক্রমে আজ আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আসল কথাটা জানতে পারলাম ; অমরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি হয়ত বলতেন, বাড়ি নেই।"

অমিয়া বললে, "না, আজ দাদাও বলতেন, বাড়ি আছেন ; আর কাল আমার সঙ্গে দেখা হ'লে আমিও বলতাম, বাড়ি নেই।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধাকর বললে, "কেন বলুন তো ?"

"কাল শেষ রাত্রি থেকে বাবা একটা লেখা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। সে লেখাটা তাঁর এত ভাল লেগেছিল যে, নিরুপদ্রবে যাতে শেষ করতে পারেন সেই জন্যে আমাদের সকলকে ব'লে দিয়েছিলেন, কেউ দেখা করতে এলে যেন বলা হয়—বাড়ি নেই। এ 'বাড়ি নেই'য়ের অর্থ, বাড়িতে কারো সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার মতো অবসর নেই, কতকটা ইংরেজী নট-অ্যাট-হোমের মতো। কাজ করতে গেলে, মাঝে মাঝে এই 'বাড়ি নেই'য়ের সাহায্য নেওয়া ভিন্ন অন্য উপায়ও থাকে না।"

সুধাকরের মন থেকে তখনো গতকল্যকার অপমানবোধ ও গ্লানি অপসৃত হয় নি। দৃঢ়স্বরে সে বললে, "ওরূপ ক্ষেত্রে বাড়ি নেই, এই মিথ্যা ভাষণ না ক'রে, বাড়ি আছেন কিন্তু দেখা করবেন না—এই কথা বলাই উচিত।"

সুধাকরের কথা শুনে অমিয়ার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল ; বললে, "তাতে জাত যাবে, কিন্তু পেট ভরবে না। একতলা থেকে দোতলায় এত স্লিপ যেতে থাকবে যে, তার উত্তর আর প্রত্যুত্তর দিতে দিতে

বাবার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে। অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা গেছে, 'বাড়ি নেই' ছাড়া উপায়ান্তর নেই। 'বাড়ি নেই' বললেও অবশ্য স্লিপ লেখা চলে, কিন্তু বাবার পক্ষে সে সব স্লিপের উত্তর দেওয়ার উপায় থাকে না।"

দৃঢ়কণ্ঠে সুধাকর বললে, "সে যাই হোক, যে অসত্য ভাষণ কাল আমার ওপর চালিয়েছিলেন, তা কোনো দিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না।"

অকস্মাৎ অমিয়ার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "রসুন, রসুন, আপনি কাল এসেছিলেন, আপনার লেখার খবর নিতে?"

সুধাকর বললে, "হ্যাঁ।"

"আপনার নাম কি বলুন তো?"

"সুধাকর চট্টোপাধ্যায়।"

"আপনার লেখার নাম?"

"নূতন দিক।"

অমিয়ার মুখমণ্ডলে কৌতুকের মিষ্ট হাসি ফুটে উঠল। কতকটা যেন আপন মনেই সে বললে, "বেশ! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর—এ ঠিক তাই হ'ল!"

তীব্র কৌতূহলে সুধাকর বললে, "তার মানে?"

"তার মানে, আপনারই উপন্যাস শেষ করবার জন্যে বাবা কাল ওই আদেশ দিয়েছিলেন।"

"শেষ করেছেন?"

"না ক'রে উপায় ছিল কি?"

"কেমন লেগেছে ওঁর?"

"কেমন আবার লাগবে? 'ক'-চিহ্নে চিহ্নিত করেছেন,—একেবারে সর্বোচ্চ চিহ্ন।"

আগুনে সহসা জল পড়ল। সমস্ত অবয়ব, যা এ পর্যন্ত তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ ছিল, ভিজে ভিজে হয়ে এল। আর দৃষ্টিভঙ্গী এমন দ্রুত-পরিবর্তনশীল হয়ে উঠল, যা একমাত্র চক্ষুলজ্জার অবর্তমানেই হওয়া সম্ভব।

অমিয়া বললে, "এখন, অব্যাহতভাবে আপনার উপন্যাস যদি শেষ করতে হয় তা হ'লে ও-পন্থা অবলম্বন না ক'রে আর কি উপায় থাকতে পারে, বলুন?"

প্রথম মুহূর্তে মুখে বাধল; কিন্তু ঘরে তো তৃতীয় ব্যাক্তর বালাই ছিল না, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুধাকর বললে, "কোনো উপায় নেই। আমি যদি আপনাকে অসত্য কথা বলতে বাধ্য করি, তা হ'লে আপনার অপরাধ কোথায় বলুন?"

অমিয়া বললে, "ঠিকই তো।"

সুধাকর বললে, "তা ছাড়া, কি সত্য আর কি যে অসত্য তা নির্ণয় করা অনেক সময়ে ভারি কঠিন ব্যাপার। আমার মনে হয়, যে-বস্তু শুভ ফল প্রসব করে, তাই সত্য; আর যা অশুভ করে তা মিথ্যা।"

অমিয়া বললে, "তা ছাড়া আর কি হতে পারে? সুধাকরবাবু, আমি আপনার উপন্যাস পড়েছি।"

উল্লসিত মুখে সুধাকর বললে, "পড়েছেন? সবটা?"

স্মিতমুখে অমিয়া বললে, "খানিকটা প'ড়ে ফেলে রাখবার মতো আপনি লিখেছেন কি? আগাগোড়া সব পড়েছি, কাল রাত দুটো পর্যন্ত জেগে। অদ্ভুত হয়েছে আপনার উপন্যাস! আপনার 'নূতন দিক' উপন্যাসে যে নূতন দিকের সন্ধান আপনি দিয়েছেন, সে দিকে চলা

তো দূরের কথা, এতদিন নজরে পর্যন্ত আমাদের পড়ে নি। আপনার নায়িকা দুহিতার জন্যে কিন্তু ভারি দুঃখ হয়।”

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না। ব্যস্ত হয়ে সমরেশ কক্ষে প্রবেশ করলে। তাকে দেখে সুধাকর ও অমিয়া তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

সুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সমরেশ বললে, “এই যে আপনি এসেছেন! বসুন, বসুন।” তারপর অমিয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, “এঁকে বলেছ অমিয়া ?”

“বলেছি বাবা।”

সুধাকরকে সম্বোধন ক'রে সমরেশ বললে, ‘নূতন দিক’ আমাদের কাছে রইল, নতুন লেখকের প্রথম উদ্যম ধূমকেতুতে প্রকাশিতও হয় সেই কথা প্রমাণ করবার জন্যে। আর একদিন আসবেন, আলাপ করা যাবে। আজ আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে,—কিছু দেরি হয়ে গেছে।”—ব'লে দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

সুধাকর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “আমিও চললাম অমিয়া দেবী।”

দাঁড়িয়ে উঠে আমিয়া বললে, “একটু চা খেয়ে যান সুধাকরবাবু।”

সুধাকর বললে, “আজ নয়। এবার যেদিন আসব সেদিন খাব। আজ বাড়ি গিয়ে সোজা শয্যা নোব।”

বিস্মিত কণ্ঠে অমিয়া জিজ্ঞাসা করলে, “ঘুমুবেন এখন ?”

“না, ঘুমব না ;—চিন্তা করব।”

“কিসের চিন্তা ?”

“এমনি, এদিক ওদিক সেদিক এলোমেলো,—যার না থাকবে মাথা না থাকবে মুণ্ডু। অর্থাৎ সোজা কথায় চিন্তাবিলাস।”—ব'লে সুধাকর হেসে উঠল।

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অমিয়া দেবী ?"

"করুন।"

"আপনি কি করেন ?"

"আমি ?—আমি ফিলসফিতে এম. এ. পড়ি।"

"আর তার সঙ্গে অবসরমতো ধূমকেতুর কাজ ?"

স্মিতমুখে অমিয়া বললে, "একটু একটু।" তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার কি পরিচয় সুধাকরবাবু ?"

সুধাকর গমনোদ্যত হয়েছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "আমার পরিচয় ? আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় আমি নতুন লেখক,—আর নিষ্ফল নতুন লেখক নই। আমার গাছে ফল ফলেছে, পাখী ডেকেছে। আচ্ছা, আসি।"

দ্বার পর্যন্ত অমিয়া সুধাকরকে এগিয়ে দিলে, এমন কি ক্ষণকাল তার গমনপথের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

বড় রাস্তায় প'ড়ে দেখা হয়ে গেল বাল্যবন্ধু রমেশের সঙ্গে।

সুধাকরের হাত চেপে ধ'রে উল্লসিত মুখে রমেশ বললে, "অভিনন্দিত করছি তোকে সুধাকর।"

হাসিমুখে সুধাকর বললে, "নতুন লেখককে ?

মাথা নেড়ে রমেশ বললে, "নতুন লেখক-টেখক জানি নে, বিলেত থেকে ফিরেই দিল্লীতে অত বড় চাকরি পেলি, তাই।"

আশ্বিন ১৩৫৮

প্রেরণা

১

প্রমীলা সেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। পরিবার অর্থে তিনটি প্রাণী: বিধবা জননী বিজনবাসিনী, এগার বৎসর বয়স্ক ছোট ভাই সমর ওরফে ভোলা, এবং বাইশ বৎসর বয়সের অনূঢ়া কন্যা সে নিজে।

বাইশ বৎসর বয়সে প্রমীলার বিবাহের বয়স হয় নি, তা বলা চলে না। আর, এ কথা একেবারেই বলা চলে না যে, তার বিবাহের এ পর্যন্ত কোনো চেষ্টা-চরিত্র হয় নি। উপস্থিত সপ্তম পাত্রের পালা চলছে; তৎপূর্বে যে ছয়টি পাত্র পর্যায়ক্রমে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা-চরিত্রের সীমান্তরেখা পর্যন্ত লড়ালড়ি ক'রে অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। যোগ্যতার দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে তাদের প্রত্যেকেরই ওজন দেখে বিজনবাসিনী সন্তুষ্ট হয়েছিল, কিন্তু প্রমীলা কাউকেই গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয় নি। প্রত্যেককেই সে একই কথা ব'লে ভাগিয়েছে,—'বিয়ে করতে প্রেরণা পাচ্ছি নে।'

এই পাষণ্ড প্রেরণা বস্তুটি প্রমীলার হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রদেশে জমাট বেঁধে ঘুমিয়ে আছে, এবং কি উপায়ে তাকে জাগ্রত করা যায়, তা আবিষ্কার করবার জন্য পাত্রগণের উৎসাহ এবং তৎপরতার অন্ত ছিল না। ব্যারিস্টার বেসুরা কণ্ঠে গান গেয়েছে, এঞ্জিনিয়ার খণ্ডিত ছন্দে কবিতা লিখেছে, ব্যবসাদার গ্যালন-গ্যালন পেট্রোল পুড়িয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলে একই উত্তর লাভ্ করেছে, 'প্রেরণা পাচ্ছি নে।'

২

ছুটির দিন, বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। স্নানের জন্য উঠি-উঠি মন সত্ত্বেও একটা বই ছেড়ে প্রমীলা উঠতে পারছে না, এমন সময়ে বিজনবাসিনী কক্ষে প্রবেশ করল। প্রমীলার হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে বন্ধ ক'রে টেবিলের উপর রেখে বললে, "হ্যাঁ রে মীলা, আট-দশ দিন ধ'রে প্রদোষ আর আসছে না কেন শুনি ?"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "এ প্রশ্নের উত্তর আমার চেয়ে তুমি কম দিতে পারবে না মা। কেন তিনি আসছেন না, সে কথা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। আমরা যা বলব, তা হবে অনুমান।"

"তাকেও তুই জবাব দিয়েছিস তা হ'লে ?"

দুইটি কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু বিজনবাসিনীর প্রতি স্থাপিত ক'রে প্রমীলা বললে, "জবাব বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও তা আগে বল ?"

মনটা পূর্ব হতেই তিক্ত হয়ে ছিল, তদুপরি কন্যার এই ন্যাকামি-মিশ্রিত বাক্য শুনে একেবারে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ঝঙ্কার দিয়ে বিজনবাসিনী বললে, "বোঝাতে চাই তোমার মুণ্ডু আর আমার পিণ্ডি। কি হতভাগা মেয়েই না গর্ভে ধরেছিলাম !"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে প্রমীলা বললে, "গর্ভে ধ'রে ভাল করেছিলে তা বলছি নে, কিন্তু হতভাগা ব'লে গাল যদি দাও, নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব। তোমার মতো যার মা আছে সে হতভাগা, এ কথা ভগবান এসে বললেও বিশ্বাস করব না।"

একটা-কোনো উচিতমতো উত্তর সহসা খুঁজে না পেয়ে বিজনবাসিনী বললে, "না, তা কেন করবে !" তারপর হতাশামিশ্রিত কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা, তোকে নিয়ে আমি কি করি, বল্ দেখি মীলা ?"

মৃদু হেসে প্রমীলা বললে, "পালিয়ে যাও মা। আমাকে নিয়ে এমন কোনো দেশে পালিয়ে যাও, যেখানে তোমাকে দুঃখ দিতে আর আমাকে জ্বালাতন করতে বিয়ে-পাগলার দল নেই।"

বিরক্তি-বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "তুই ওদের বিয়ে-পাগলার দল বলছিস ?"

বিজনবাসিনীর কথার ভঙ্গী দেখে প্রমীলার মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য দেখা দিল ; বললে, "বলব না কেন মা ? তুমি তো স্বচক্ষে পড়েছ অজয় দত্তের কবিতা, আর স্বকর্ণে শুনেছ তারক মিত্তিরের গান। আচ্ছা, তুমিই বল, ওদের পাগল বললে খুব অন্যায় করা হয় কি ?"

কবিতা এবং গানের উল্লেখে বিজনবাসিনীরও মুখে হাসি দেখা দেবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু পাছে হাসি দেখে অবাধ্য কন্যা আস্কারা পায় সেই ভয়ে হাসি দমন ক'রে গম্ভীর মুখে বললে, "প্রদোষও গান গায় ?—কবিতা লেখে ?"

মাথা নেড়ে প্রমীলা বললে, "না, ও দুটি গুণ ওঁর আছে, তা স্বীকার করতেই হবে।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "ও ! ঐ দুটি গুণই ওর আছে, আর কোনো গুণ নেই ! তোর মতলব কি বল্ দেখি মীলা ?"

হাসিমুখে প্রমীলা বললে, "আমার মতলব অসাধু নয় মা। আমার মতলব তোমার সেবায় আর ভোলাকে মানুষ ক'রে তোলবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করা।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "ওঃ ! ঢং দেখে বাঁচি নে ! আমার সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন ! প্রদোষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলে তোর জীবন ধন্য হ'ত তা ভাল ক'রে জেনে রাখিস। তুই তার ক'ড়ে আঙুলেরও যোগ্য নোস্।"

"হাতের, না, পায়ের ?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ঔৎসুক্যের সহিত বিজনবাসিনী জিজ্ঞাসা করলে, "কি হাতের, না, পায়ের ?"

"ক'ড়ে আঙুল ?"

"পায়ের, পায়ের, পায়ের !" বিজনবাসিনী তর্জন ক'রে উঠল।

ভালমানুষের মতো মুখ ক'রে শান্তকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "আমি তো তোমারও পায়ের ক'ড়ে আঙুলের যোগ্য নই, তাই ব'লে কি মা, তোমাকে বিয়ে করতে হবে ?"

"আমি কি, তোমাকে বিয়ে করবার জন্য গান গাচ্ছি, না, কবিতা লিখছি ?" ব'লে রণে ভঙ্গ দিয়ে বিজনবাসিনী দুদ্দাড় ক'রে প্রস্থান করলে।

কৌতুকমিশ্রিত সুমিষ্ট হাসির দ্বারা মুখমণ্ডলকে অপূর্ব ক'রে প্রমীলা ক্ষণকাল নিঃশব্দে ব'সে রইল, তারপর ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে পূর্বোক্ত বইখানাকে শেল্‌ফের মধ্যে তুলে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

প্রদোষের বিষয়ে এত কথার পর এ কথা বোধ করি বলা বাহুল্য যে, সে প্রমীলার পাণিপ্রার্থী সপ্তম পাত্র। বিজনবাসিনীর যোগ্যতার দাঁড়িপাল্লায় পূর্বতন ছয়টি পাত্রের মধ্যে কারো অপেক্ষা সে লঘু নয়।

৩

ঘটনাক্রমে সেই দিনই সন্ধ্যার পর প্রদোষ এসে উপস্থিত।

পরীক্ষা নিকটবর্তী ব'লে সন্ধ্যা থেকে ভোলা পাঠে মনোনিবেশ করেছিল ; এবং প্রদোষ ও প্রমীলা একান্ত আলাপের সুযোগ পেলে তা

থেকে সুবিধাজনক কিছু প্রত্যাশা করা যেতে পারে মনে করে বিজন-বাসিনী প্রদোষকে চা-খাবার খাইয়ে নিজ শয়নকক্ষে 'অমিয়-নিমাইচরিত' খুলে আত্মগোপন করেছিল।

দু-চারটে সাধারণ কথার পর আসল কথা উঠল। প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "এত দিন আসেন নি কেন প্রদোষবাবু?"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "বোধ হয় আসবার প্রেরণা পাই নি ব'লে।" প্রমীলার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, তারই কড়িতে প্রদোষ তার দেনা পরিশোধ করলে। পাল্টা আঘাতটুকু বিনা প্রতিবাদে পরিপাক ক'রে সে বললে, "আজ তবে কিসের প্রেরণায় এলেন?"

"তোমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রেরণায়।"

প্রদোষের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রেরণায়? কেন, ধন্যবাদের কি করেছি আমি?"

স্মিতমুখে প্রদোষ বললে, "আমার প্রতি সদয় হয়েছ।"

ততোধিক বিস্ময়ে প্রমীলা বললে, "সদয় হয়েছি? কিন্তু কোনো দিন তো আপনার প্রতি অসদয় ছিলাম না।"

"সর্বনাশ! যা ছিলে তাকে যদি সদয় থাকা ব'লে তা হ'লে তোমার সদয় থাকা থেকে ভগবান আমাকে রক্ষে করুন!" ব'লে হো-হো ক'রে প্রদোষ হেসে উঠল। তারপর অভয়-দানের মিষ্টি স্বরে বললে, "কিন্তু ঘাবড়াবার কারণ নেই। সদয় হয়েছ জাগ্রত জীবনে নয়, স্বপ্নে।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রমীলা বললে, "ও হরি! স্বপ্নে?" তারপরই মুখ ঈষৎ গম্ভীর ক'রে নিয়ে বললে, "ও কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নে প্রদোষবাবু।"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "কি বিশ্বাস কর না? স্বপ্ন? না, স্বপ্ন দেখা?"

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে প্রমীলা টেবিলের উপরকার একটা কাগজ-চাপা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

প্রদোষ বললে, "বুঝেছি। তোমার পেপার-ওয়েটের নাড়াচাড়া দেখে বুঝতে বাকি নেই যে, তুমি বোঝাতে চাও, আমি স্বপ্ন দেখেছি সে কথাও তুমি বিশ্বাস কর না। তর্কের খাতিরে যদি ধ'রে নেওয়াই যায় যে, বস্তুত আমি স্বপ্ন দেখি নি, কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির মতলবে মিথ্যা স্বপ্নের ওজুহাত তুলেছি, তা হ'লেও এ মিথ্যার মূল্য আছে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রমীলা বললে, "থাকলেও, সে মিথ্যার মূল্য এত অল্প যে, তার দ্বারা বিশেষ কিছু মূল্যবান বস্তু কেনা যায় না।"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "তুমি যে শুধু মূল্যবান নও, অক্রেয়ও,—তা আমি জানি প্রমীলা। It is better to have tried and failed, than never to have tried at all—তোমার সঙ্গে আমি সেই খেলা খেলছি। অপরকে চেষ্টা ক'রে পাওয়ার চেয়ে তোমাকে চেষ্টা ক'রে না-পাওয়া আমি শ্রেয় মনে করি।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "ভুল মনে করেন প্রদোষবাবু। অপাত্রে এত মূল্য আরোপ করবেন না।"

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাসিমুখে প্রদোষ বললে, "ভুল মনে করি, কি ঠিক মনে করি, সে কথা না হয় বাড়ি গিয়ে একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখা যাবে,—আপাতত চললাম।"

"কোথায়?"

"বন্ধুবান্ধবের সন্ধানে। এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে কোনো লাভ নেই।"

"তা হ'লে এখানেই তো আর কিছুক্ষণ থাকতে পারতেন?"

"যে গাছের ফুল অধিকারে আসবার সম্ভাবনা নেই, সে গাছের তলায় বিলম্ব ক'রে কোনো লাভ আছে কি?" ব'লে প্রদোষ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল; তারপর সহসা মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, "মনস্তত্ত্বের একটা ছোট্ট কথা বলব?"

স্মিতমুখে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা?"

"তোমার মনে প্রেরণা জাগবার যদিই বা ছায়ার মতো কোনো ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকে তো এ তোমাকে নিশ্চয় বলছি, নিজেকে অযথা সস্তা করলে একেবারেই তা লুপ্ত হবে।" ব'লে প্রদোষ আর-এক দফা উচ্চহাসি হাসলে।

প্রমীলা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না; শুধু তার ওষ্ঠাধরে কৌতুকের অতি ক্ষীণ নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলে, "আবার কবে আসবেন?" কিন্তু প্রদোষ কোনও উত্তর দেবার পূর্বেই ব্যস্ত হয়ে বললে, "না না, উত্তর দিতে হবে না আপনাকে,—আমি আমার প্রশ্ন তুলে নিচ্ছি। 'যে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই, সে গাছতলায় আবার একদিন এসে কি লাভ?'—এই ধরনের একটা উত্তর দেবেন তো?"

প্রমীলার কথা শুনে প্রদোষ পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। বললে, "আমার মন তোমার কাছে স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছে প্রমীলা। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত।"

প্রদোষ প্রস্থান করবার পর বিজনবাসিনী জিজ্ঞাসা করলে, "প্রদোষ অত হাসছিল কেন রে মীলা?"

প্রমীলা বললে, "জোরে জোরে?"

"জোরে জোরে না তো কি মুচকি হাসির কথা জিজ্ঞাসা করছি? কথা শুনে গা জ্বলে!"

শান্তকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "অল্প কারণে প্রদোষবাবু জোরে জোরে হাসেন।"

"তাই তো! প্রদোষবাবুর আর কাজ নেই, অল্প কারণে জোরে জোরে হাসেন! এত শীগগির চ'লে গেল যে?"

"ভোলা রইল পড়ায় ব্যস্ত, তুমি দিলে ঘরে ঢুকে গা-ঢাকা,—একা আর আমার সঙ্গে কত গল্প করবেন?"

"অত ঢঙের কথা শোনবার আমার সময় নেই!" ব'লে বিজনবাসিনী বিরক্তিবিরূপ মুখে প্রস্থান করলে।

৪

মাস দুই পরে আবার একদিন প্রদোষ এসে দেখা দিলে। ভদ্রতা রক্ষার্থে প্রমীলাকে বলতেই হ'ল, "এতদিন আসেন নি কেন প্রদোষবাবু?"

স্মিতমুখে প্রদোষ উত্তর দিলে, "স্বপ্ন দেখি নি ব'লে।"

"কি আশ্চর্য! স্বপ্ন দেখলে তবে আপনি আসবেন?"

"সব স্বপ্ন দেখলেই নয়,—যে স্বপ্নে আমার প্রতি তুমি সদয় হবে, সেই স্বপ্ন দেখলে আসব।"

"দেখেছেন না-কি স্বপ্ন?"

"দেখেছি,—কাল ভোর রাত্রে।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে প্রমীলা বললে, "আপনার ঘুম হয় প্রদোষবাবু?"

উৎসাহভরে প্রদোষ বললে, "গভীর ঘুম হয়। পড়ি আর ঘুমুই।"

"তবে বোধ হয় আপনার ঠিক হজম হয় না।"

"ক্ষেপেছ! সকালে উঠে ক্ষিদের চোটে কি খাই কি খাই, টেবিল খাই, না চেয়ার খাঁই, করি।"

"তবে এত স্বপ্ন দেখেন কেন ?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে প্রদোষ বললে, "কিন্তু দেখি ব'লে তো তুমি বিশ্বাস কর না প্রমীলা ?"

প্রদোষের কথা শুনে প্রমীলার মুখে অপ্রতিভতার ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে। কতকটা যেন নিজেকে সংশোধিত করার ছলেই বললে, "তাও বটে।" তারপর প্রদোষের প্রতি মুখ তুলে সহজভাবে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আচ্ছা, তর্কের খাতিরে ধরাই যদি যায় যে, দেখেন,—তা হ'লে সে কথাটুকু কোন্ লাভের জন্যে আমাকে জানাতে আসেন ?"

শান্তকণ্ঠে স্মিতমুখে প্রদোষ বললে, "লাভের জন্যে আসি নে প্রমীলা, লোভে প'ড়ে আসি।"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "লোভে প'ড়ে ?—কিসের লোভ ?"

"এইটুকু সুসংবাদ তোমাকে জানাবার লোভ যে, 'আমারও ভাগ্যে পড়ে নি পড়ে নি কেবলই ফাঁকি।' স্বপ্নে-পাওয়া অবশ্য ষোল-আনা পাওয়া নয় ; কিন্তু ষোল-আনা না-পাওয়া, তাও আমি মনে করি নে।" ব'লে প্রদোষ উঠে দাঁড়াল।

প্রমীলাও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চললেন ?"

প্রদোষ বললে, "নিঃসন্দেহ।"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "এত শীগগির কেন চললেন, সে কথাও তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার উপায় নেই।"

"কেন বল দেখি ?"

"বলবেন, বেশিক্ষণ থেকে নিজেকে সস্তা করতে নেই।"

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে প্রদোষ বললে, "সে কথা মনে আছে তোমার ?—আর সে কথা মনে নেই ?"

"কোন্ কথা ?"

"সুদূর সম্ভাবনার কথা ?"

প্রমীলার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে ; মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ, তা-ও আছে।"

৫

মাত্র দিন-ছয়েক পরে প্রদোষকে পুনরায় আসতে দেখে প্রমীলা ঈষৎ বিস্মিত হ'ল। কিন্তু এমন কোন কথা সে বললে না, যাতে তার বিস্ময় প্রকাশ পায়।

কথাটা তুললে প্রদোষ নিজেই ; বললে, "এবার এত শীগগির এলাম ব'লে মনে ক'রো না বিনা-স্বপ্নে এসেছি।"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "বিনা-স্বপ্নে আসবার তো কথা নেই আপনার।"

"না, তা নেই। একটা কথা তুমি কিন্তু নিশ্চয় স্বীকার করবে প্রমীলা।"

"কি কথা ?"

"গত দুবারের স্বপ্ন দেখার আমি শুধু জানান্-ই দিয়ে গেছি ; স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে তোমাকে বিব্রত করবার চেষ্টা করি নি।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "আপনার সে রুচিবোধের জন্যে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ প্রদোষবাবু।"

প্রদোষ বললে, "ধন্যবাদ। কিন্তু এবারকার স্বপ্ন এমন যে, এবারকার স্বপ্নের বিবরণ দিলেই তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। তবে স্বপ্নের কাহিনী শুনে তোমার মুখে কৌতুকরসের যে সুমিষ্ট হাসিটুকু ফুটে উঠবে, তা-ই হবে আমার-দেখা তোমার মুখের শেষ হাসি।"

পরম কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?"

"কারণ, এর পর স্বপ্ন দেখে তোমাকে জানাতে এলে তা হবে ভূতের স্বপ্ন দিয়ে তোমাকে ভয় দেখানো।"

"তার মানে ?"

"স্বপ্নের কাহিনী শুনলে তার মানে আপনিই বোঝা যাবে। বলব ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে প্রমীলা বললে, "বলুন।"

মনে মনে একটু-কি ভেবে নিয়ে প্রদোষ বললে, "স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন রোগশয্যায় শুয়ে আছি; একজন ডাক্তার পাশে দাঁড়িয়ে স্টেথোস্কোপ নাড়তে নাড়তে বললে, আর আশা নেই।···আত্মীয়রা চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদছে। এমন সময়ে তুমি এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'শুনছেন ? আপনি ম'রে যাচ্ছেন'।···আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সেই রকমই তো শুনছি'। তার উত্তরে তুমি বললে, 'আপনি মরছেন, কিন্তু আমি বাঁচলাম'।···ঘুম ভেঙে দেখি, কাক-কোকিল ডাকছে। ভারি মজার স্বপ্ন, নয় প্রমীলা ? ···এ কাহিনীতে কিন্তু তোমার বিব্রত হবার মতো কোনো ঘটনা নেই।"

প্রমীলা কোনো উত্তর দিলে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ বললে, "স্বপ্ন অবশ্য স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়,—কিন্তু তাই ব'লে স্বপ্নকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। একজনের নিশ্চেতন মনের গভীর চিন্তা অথবা বাসনা অপর একজনের নিশ্চেতন মনে প্রতিফলিত হয়ে হয়তো স্বপ্ন দেখায়।"

এ কথারও প্রমীলা উত্তর দিলে না।

৬

পরদিন সকালে প্রদোষ চা-পানান্তে খবরের কাগজ খুলে বসেছে, এমন সময়ে প্রমীলার ভাই ভোলা এসে পাশে দাঁড়াল।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ভোলাকে দেখে সহাস্যমুখে প্রদোষ বললে, "কি ভোলা, কি খবর ?"

ভোলা বললে, "আজ সন্ধ্যার সময়ে দিদি আপনাকে একবার যেতে বলেছেন।"

"আমাকে যেতে বলেছেন ?"

"হ্যাঁ, আপনাকে।"

"ঠিক শুনেছ ?"

"ঠিক শুনেছি।"

"কি নাম বল দেখি আমার ?"

নিঃশব্দে হাসির দ্বারা এই পরিহাসমূলক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গমনোদ্যত হয়ে ভোলা ফিরে তাকিয়ে বললে, "নিশ্চয় যাবেন, নইলে দিদি রাগ করবেন।"

যথাকালে প্রমীলার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রদোষ বললে, "বিনা-স্বপ্নে আসার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কারণ তোমার তলব পেয়ে এসেছি।"

প্রমীলা বললে, "বিনা-স্বপ্নে আপনি আসেন নি।"

গভীর বিস্ময়ে প্রদোষ বললে, "আসি নি ? কেন বল দেখি ?"

"বসুন, বলছি।"

একটা চেয়ার টেনে ব'সে সকৌতূহলে প্রমীলার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রদোষ বললে, "বল।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে প্রমীলা বললে, "কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি।"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রদোষ বললে, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ ? কি স্বপ্ন দেখেছ ?"

প্রমীলার মুখমণ্ডল টকটকে হয়ে উঠল। একবার প্রদোষের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নতমুখে সে বলতে লাগল, "স্বপ্ন দেখেছি, যেন বিয়ে-বাড়ি,

হৈ-চৈ হচ্ছে, বাজনা-বাদ্যি বাজছে···আমি কনে সেজে আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে ব'সে আছি। এমন সময় শাঁক বাজল,···বর এলেন আপনি। আর···আর···আমি উঠে দাঁড়িয়ে আপনার গলায়···"

"মালা দিলে ?"

"দিলাম।"

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ বললে, "কিন্তু স্বপ্নের প্রসঙ্গকে আমরা তো মিথ্যা ব'লে সন্দেহ করি প্রমীলা ?"

আরক্তমুখে প্রমীলা বললে, "মিথ্যা হ'লেও সে মিথ্যার মূল্য আছে।"

উত্তেজনার বশে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রদোষ বললে, "আছে ? ···আছে প্রমীলা ?—তা হ'লে কি শেষ পর্যন্ত তোমার মনে প্রেরণা জাগল ?"

প্রদোষের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে নতনেত্রে মৃদুস্বরে প্রমীলা বললে, "বোধ হয়।"

সমাপ্ত